# দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

# আল কোরআন আর্কাইভ- ২০১৫

## দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

## নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

## ২০১৫ ঈসায়ী

# সূচীপত্র


বন্দিদের মুক্তির চেষ্টা সবার উপর আবশ্যক ..... ৪

দারুণ, আল্লাহ আমাকে স্মরণ করবেন?..... ৭

কোরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত ..... ১০

কোরানের ভাষায় মিডিয়া যুদ্ধের পদ্ধতি very usefull..... ১২

সত্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা ..... ১৭

দ্বীনের জন্য থাকা চাই ঐক্য..... ২০

উম্মাহর ভোরের-পাখিদের তুমি বরকত দাও! ..... ২২

যদি মুমিন হও , তোমরাই জয়ী হবে ..... ২৬

অন্ধ বিশ্বাস: ব্যাক্তিপূজার ইসলামী ছদ্মবরণ ..... ৩০

মনগড়া হিকমাহ নিফাকীর আলামত..... ৩৫

পরিক্ষা মুজাহিদকে শক্তিশালী করে ..... ৪০

উদারতা ও দানশীলতাকে শেখার উপায় ..... ৪৩

আল-কোরআনে মানুষের বৈশিষ্ট্য very nice..... ৪৭

নিয়ত বনাম ইমেজ সচেতনতা ..... ৫১

আপনার উপর আল কুর'আনের ৯ টি হক..... ৫৬

যে শরীয়ত মানে না তার মুরুব্বি শায়তান ..... ৬৩

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ ..... ৬৪

# বন্দিদের মুক্তির চেষ্টা সবার উপর আবশ্যক

কাল পতাকা

Senior Member

১০-২৯-২০১৫

আল্লাহ্* সুবহানাহু ওয়াতা'আলা কুরআনে সূরা বাকারাহ-এ বলেন,

“অতঃপর তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিস্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।” [ ২:৮৫]

এই আয়াতে বনী ইসরাইলের একটি ঐতিহাসিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে । তা হচ্ছে তারা কখনই তাদের গোত্রীয় বা জ্ঞাতিভাইকে ভুলে যায় না। ইউশা ইবনে নুন (আঃ) এর মৃত্যুর পরে বনী ইসরাইলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তাদের এক গোত্র অন্য গোত্রকে আক্রমন করতে থাকে এবং নিজ ভূমি থেকে তাড়িয়ে বহিঃশত্রুর হাতে নিজেদের ভাইদের তুলে দিতে থাকে। তাদের মধ্যে একটি গুণ তখনও বিদ্যমান ছিল, তা হচ্ছে তাদের গোত্রের কেউ বন্দি হলে তারা তাকে উদ্ধার করতে ব্যস্ত হয়ে যেত, যদিওবা তারা নিজেরাই প্রাথমিকভাবে এসব শুরুর পেছনে দায়ী!।

আজকেও আপনারা তাদের এই মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখতে পারবেন, যখনই কোন ইসরাইলী সৈন্যকে বন্দি করা হয় তখনই তারা তাকে উদ্ধারে সচেষ্ট হয়ে পরে। ২০০৬ সালে গোটা ইসরাইলী বাহিনীর লেবানন আক্রমনের পেছনে অজুহাত ছিল গুটিকয়েক ইসরাইলী সৈন্যকে মুক্ত করা। এমনকি ইসরাইলীরা যখন হামাসের সাথে প্রায়ই বন্দী বিনিময় করে তখন বন্দী বিনিময়ের অনুপাতটি বেশ চমকপ্রদ,

যেমন দশ হাজার প্যালেস্টাইনীর বিনিময়ে মাত্র তিন জন ইসরাইলী সৈন্য। বনী ইসরাইলের এটি একটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য যা তারা আজও ধরে রেখেছে। শত্রুর হাতে পতন আসন্ন হয়ে পড়লেও তারা যেকোন মূল্যে তাদের বন্দীভাইকে মুক্ত করার চেষ্টা করে।

প্রথম যুগের মুসলিমরা তাঁদের বন্দী মুসলিম ভাইদের উদ্ধারের ব্যাপারে ঠিক এমনই যত্নশীল ছিলেন। 'উমার ইবন 'আবদুল আজিজ (রা) যে কোন পরিমাণের মুক্তিপণ দিয়ে হলেও মুসলিম বন্দীদের ছাড়িয়ে আনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আল ইমাম আল আওযা'ই নিজেই দায়িত্ব নিয়ে চিঠি লিখে আবু জা'ফর আল মানসুরকে নিয়মিত স্মরণ করিয়ে দিতেন, যেকোনো প্রকারেই যেন রোমানদের হাত থেকে মুসলিম বন্দীদের উদ্ধার করা হয়। মুসলিম বন্দীদের উদ্ধারের ব্যাপারে ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ ছিলেন নিবেদিত এক অক্লান্ত প্রাণ- চিঠি লিখে, সমঝোতা করে, যুদ্ধ করে হলেও তিনি মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। আল হাজ্জাজ ও আল মু'তাসিমের মত অত্যাচারী মুসলিম শাসকরাও কুফফারদের কারাগারে বন্দী এক দুজন মুসলিমকে উদ্ধার করতে সমগ্র শহরে আক্রমন করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। আল মানসুর বিন আলি 'আমির ঘোড়ার পিঠে চড়ে কর্ডোভা থেকে উত্তর আন্দালুসিয়ায় এসেছিলেন শুধুমাত্র এক মুসলিম বন্দীর মায়ের অনুরোধ রক্ষার্থে, খ্রিস্টানদের হাতে আটক তার ছেলেকে উদ্ধারের জন্য।

এটাই আমাদের অতীত, এটাই আমাদের ঐতিহ্য- যা বিশ্বস্ততা, সাহস আর নিঃস্বার্থতার কাহিনীতে পূর্ণ। এ ছিল এমন এক অতীত, যখন মানুষ নিজের আরাম আয়েশের চেয়ে অন্যের স্বস্তি আর নিরাপত্তার প্রতি অধিক মনযোগী ছিল। আমাদের উচিত তাঁদের থেকে শিক্ষা নেয়া, - এবং বনী ইসরাইল থেকেও। আমাদের হৃদয় থেকে কাপুরুষতা দূর করতে হবে, সরিয়ে ফেলতে হবে স্বার্থপর ধ্যান ধারণা এবং উম্মাহর প্রতি আরো অনুগত,বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল হতে হবে। একজন মানুষ কিভাবে পারে নিজেকে মুসলিম কমিনিউটির ''সক্রিয় কর্মী'' বলে দাবি করতে, অথচ তাদের ভাইরা (শুধু ভাই নয়, এখন আমাদের বোনেরাও) বন্দী রয়েছে কানাডা, আমেরিকা, গুয়ান্তানামো বে, ব্রিটেন, ভারত ইত্যাদি দেশের কারাগারে আর সে তাদের উদ্ধারের ব্যাপারে কোন ভূমিকাই পালন করছে না। মুসলিম ভাইদের পাশে দাঁড়ালে আপনার কি ক্ষতিটা হত? পশ্চিমা ''আলেম''রা পরিষ্কার ভাবেই এই ব্যাপারে নিজেদের অনাগ্রহ দেখিয়ে দিয়েছে, কাজেই

অতীতের দিকে ফিরে তাকান। রাসুল(সা) ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, সামরিক প্রধান, স্বামী, পিতা, শিক্ষক এবং আল্লাহর রাসুল। এই শত ব্যস্ততাও তাঁকে অত্যাচারিত মুসলিমদের নাম স্মরণ করতে ও তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো থেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে নি। আবু হুরায়রা(রা) হতে বর্ণিত যে, রাসুল (সা) তাঁর দু'আতে মুমিনদের নামগুলো ধরে ধরে উচ্চারণ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন এই বলে যে, "ও আল্লাহ্*! আল ওয়ালিদ বিন আল ওয়ালিদ, সালামাহ বিন হিশাম এবং আইয়াশ বিন আবু রাবিয়াহ সহ সকল অত্যাচারিত মুমিনদের তুমি উদ্ধার করো।" প্রকাশ্যে ও জনসম্মুখে তিনি মজলুমদের জন্য দু'আ করতেন।

বনি ইসরাইলীরা ফিতরাতে যে বৈশিষ্ট্যটা পেয়েছে তা তারা ধরে রেখেছে। এটা মুসলিমদের জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা তাদের পেছনে পড়ে আছি। এটি লজ্জার বিষয় যে আমরা আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষায় লজ্জাজনক ভাবে ইহুদিদের কাছে পরাস্ত হচ্ছি।

তারিক মেহান্না,

প্লিমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি,

আইসলেশন ইউনিট – সেল # ১০৮

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০০৪

## “দারুণ, আল্লাহ আমাকে স্মরণ করবেন?”

কাল পতাকা

Senior Member

১১-০৩-২০১৫

সূরা বাকারাহর ১৫২ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানু তা’আলা বলেনঃ

“অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর,আমিও তোমাদের স্মরণকরব”।

এই আয়াতের নিয়ে উল্লেখ করার মত বেশ কিছু বিষয় আছে। প্রথমত, আয়াতটি পড়ে এই ভেবে আপনার সম্মানিত বোধ করা উচিত, “দারুণ, আল্লাহ আমাকে স্মরণ করবেন?” মানুষ সাধারণত তাঁর কাজের জন্যে পরিচিত হতে ভালোবাসে। এটা হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করা, গরীবকে খাওয়ানো, মসজিদ পরিষ্কার করা- যে কাজই হোক না কেন, যখন একজন মানুষ আপনাকে আপনার কাজের জন্যে চিনবে এবং প্রশংসা করবে তখন আপনার ভালো লাগবে। এই কারণে অনেকেই তাদের কলেজের ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট, পুরস্কার, স্মৃতিফলক এ ধরণের জিনিষগুলো দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। এর মাধ্যমে কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য অন্যের কাছ থেকে সাক্ষ্য বা স্বীকৃত লাভের আশা করা হয়। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল, আপনি অন্যের মতামতকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ গুরুত্ব দেন এবং তাদের স্বীকৃতি আপনার অন্তরে গর্ববোধের জন্ম দেয়। এর মাধ্যমে আপনি কাজের গুরুত্বও প্রতিফলিত হয়।

এখন ভেবে দেখুন, কোন মানুষ নয় বরং মানবজাতি ও সমগ্র মহাবিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্তাও পালনকর্তা, তিনি আপনাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন! তিনি আপনার কথা আলাদা করে স্মরণ করছেন!এই ব্যাপারটি তো আপনাকে ভেতর থেকে নাড়িয়ে দেওয়ার কথা! এটি জানা মাত্রই আপনার ভাবতে বসে যাওয়ার কথা, আচ্ছা কোন সে কাজ যার জন্য আল্লাহ আপনাকে স্মরণ করছেন? আপনি ভাববেন,“এই যে যিক্কির (আল্লাহকে স্মরণ), এর মধ্যে কি এমন আছে যাতে আত্মনিমগ্ন হবার কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা’আলা হাজার-লক্ষ-কোটি সৃষ্টির মাঝ থেকে আমাকে বেছে নিয়েছেন? অথচ কাজটা কতই না সহজ! আপনি এমন একজন,

যিনি কিনা অন্যের স্বীকৃতি ও প্রশংসা পেয়েই সম্মানিত ও গর্ববোধ করছেন, এই আয়াতটি পড়ে যখন আপনি অনুভব করবেন সমগ্র বিশ্বের মালিক আপনাকে স্মরণ করছেন, তখন কি আপনি এর চাইতেও বহুগুণ বেশি গর্ব আর সম্মান বোধ করবেন না?। আর এটা তো এমন এক স্বীকৃতি যা অমূল্য, কেননা তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।

দ্বিতীয়ত, আপনার জানা উচিত যে যিকির দুই ধরনেরঃ একটি অভ্যাসগতভাবে আর অপরটি ঘটে থাকে সচেতন চিত্তে, এবং এর মাঝে একমাত্র একটা ধরণই কেবল আল্লাহর স্বীকৃতি এনে দিতে পারে । ইবন আল-যাওজী এটি বর্ণণা করেছেন:

"একজন অমনোযোগী 'সুবহানাল্লাহ'বলবে অভ্যাসের বশে। আর একজন সচেতন ব্যক্তি, সে সর্বদা সৃষ্টির রহস্য বা সৃষ্টিকর্তার সুন্দর বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা করতে থাকবে এবং বলে উঠবে 'সুবহানাল্লাহ'। তাই, এই তাসবীহ হচ্ছে চিন্তাশীলমনের গভীর ভাবনার ফসল। সচেতনরা এভাবেই তাসবীহ পাঠ করে। আর তারা অতীতের গুনাহের কুৎসিত দিক নিয়েও ভেবে দেখবে আর এটি তাদের ধাবিত করবে গভীর ভাবনায় ডুবে যেতে, উদ্বিগ্ন হতে, অনুতাপ করতে। এই চিন্তা থেকে তারা বলে উঠবে 'আস্তাঘফিরুল্লাহ' (অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই)। এটাই সত্যিকারের তাসবীহ এবং ইস্তিগফার। আর একজন গাফেল ব্যাক্তিও তাসবীহ পাঠ করবে এবং ইস্তিগফার করবে,তবে অভ্যাসের বশে, উপলব্ধি থেকে নয়। আহ! কতই না পার্থক্য এ দুটি ধরনের মাঝে....."

পরিশেষে, এই আয়াতে আল্লাহর উদারতার নিদর্শনও পাই। দেখুন, তিনি আপনাকে স্মরণ করবেন, স্বীকৃতি দেবেন, পুরস্কৃত করবেন, কারণ আপনি তাঁকে স্মরণ করেছেন, কিন্তু সেটি কখন? প্রথমত তিনি আপনার উপর রহম করেছেন, এবং তা অবলোকনের পরেই কিনা আপনি তাঁর স্মরণের দিকে ধাবিত হয়েছেন, তার আগে নয়! আপনি তাঁকে স্মরণ করেছেন যখন আপনি তাঁরই দেয়া খাবার খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা একটি নি'আমত। আপনি তাঁর দেয়া ঘরে প্রবেশ করছেন, যা তার একটি নি'আমত। আপনি তাঁরই দেয়া নি'আমত বিছানায় ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁরই দেয়া নি'আমত ঘুম থেকে উঠছেন আর তাঁর দেয়া দৃষ্টি শক্তি ব্যবহার করছেন, তাঁরই সৃষ্টিকরা প্রকৃতির বিস্ময় দেখছেন, আপনার ঘরে তাঁরই দেয়া নি'আমত শিশুর জন্মে আনন্দে উদ্বেলিত উপভোগ করছেন –

আপনার পুরো জীবনটিই তাঁর দেয়া উপহার আর রহমতে ভরা – সমস্ত কিছুই তাঁর দেয়া। তাই, এই আয়াত আপনাকে বলছে যে আল্লাহ আপনাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এ কারণে যে আপনি তাঁকে স্মরণ করেছেন, আর আপনি তাকে স্মরণ করেছেন আল্লাহর দেওয়া রহমতের কারণে, যা কিনা আল্লাহ সবকিছুর আগেই আপনাকে দান করেছেন!

তারিক মেহান্না,

প্লিমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি,

আইসলেশন ইউনিট – সেল # ১০৮।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১০৬২

# কোরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত

power

Senior Member

১০-০৯-২০১৫

পবিত্র কোরআনে কারিম মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। আল্লাহ তায়ালা এতে মুসলমানদের জীবনযাপনের যাবতীয় পদ্ধতি মৌলিকভাবে বলে দিয়েছেন। হজরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে কোরআন সরাসরি রাসুল (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর রাসুল (সা.) তা সাহাবায়ে কেরামকে পাঠ করে শুনিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে তা অবিকৃতভাবে আমাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছেছে।

পৃথিবীতে একমাত্র গ্রন্থ যাতে আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্রও বিকৃতি আসেনি। সেই কোরআন বোঝার প্রথম ধাপ হলো তা সহিহ-শুদ্ধভাবে পড়া। আর কোরান বোঝার জন্য কোনো শিক্ষক প্রয়োজন। কোনো শিক্ষক ছাড়া সঠিকভাবে কেউ কোরআন বুঝতে পারবে না। নবী করিমকে (সা.) পাঠানোর অন্যতম উদ্দেশ্য মুমিনদের কিতাবের তালিম দেয়া। কাকে তালিম দেবেন? আবু বকর সিদ্দিক, ওমর ফারুক, ওসমান গনি ও আলীকে (রা.)? তাঁরা কি আরবি ভাষা জানতেন না? তাদের প্রত্যেকেই তো আরবি ভাষায় এক একজন পণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং আরবি ভাষা শেখার জন্য বা এর অনুবাদ জানার জন্য কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল না অথচ নবী করিমকে (সা.) আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন কিতাবের তালিম দেয়ার জন্য।

এর দ্বারা জানা গেল নিছক তরজমা জেনে নেয়ার দ্বারা কিতাবুল্লাহ বুঝে আসবে না, এর দ্বারা কোরআনের ইলম হাসিল হবে না। অনেকেই বলেন আমার কোনো শিক্ষকের দরকার নেই, আল-কোরআনের অনুবাদ দেখেই আমি কোরান বুঝে নেব। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা, কোন কোরআনের তালিম দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা নবী করিমকে (সা.) দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন? তিনি ৩৩ বছর পর্যন্ত তালিম দিয়েছেন।

সাহাবায়ে কেরাম এর ওপর নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাবেয়ীনরা এটা

সংরক্ষণ করে আমাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। এসব বিষয়কে পাশ কাটিয়ে কেউ কেউ বলে আমাদের এসব বিষয়ের দরকার নেই। আমি যা বুঝব এটাই হলো সহিহ। তাহলে তাদের চেয়ে বড় গণ্ডমূর্খ আর কে হতে পারে?

**কোরআনের প্রথম হক হলো তা বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করা। এরপর শিক্ষকের মাধ্যমে তা বোঝা।**

**তবে এরও আগে দরকার আখলাকের পরিশুদ্ধি। কারণ কোরআন একটি নূর। আখলাকের পরিশুদ্ধি ছাড়া কোনো নূর ভেতরে ঢুকতে পারে না।**

**মনে রাখতে হবে, কোরআন গতানুগতিক কোনো গ্রন্থ নয়।**

**গতানুগতিক ধারায় পড়লে তা বুঝে আসবে না।**

**এ জন্য কোরআন শিখতে এবং বুঝতে হবে শরিয়তের নির্দেশিত পন্থায়।**

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৪০

## কোরানের ভাষায় মিডিয়া যুদ্ধের পদ্ধতি very usefull

কাল পতাকা

Senior Member

১১-১৮-২০১৫

কুরআনে সূরা বাক্বারার ২১৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

"সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্দ্বকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ ..."

হিজরী ২য় বর্ষে এই আয়াত নাযিল হয়। রাসূল (সাঃ) 'আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ এর নেতৃত্বে ১২ জন সাহাবীকে কুরাইশদের একটি খাবারবাহী কাফেলার গতিরোধ করতে নাখলাহ (মক্কা ও তায়েফের মাঝামাঝি) নামক স্থানে প্রেরণ করেন। 'আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ যখন সেই কাফেলার কাছাকাছি গেলেন তখ্ন তারা সেখানে কিছু মুশরিকের দেখা পেল যারা মুসলিমদের উপর জুলুম-নির্যাতনে সবরকমের সীমা অতিক্রম করেছিল। তারা মুসলিমদের অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, মুসলিমদের ঘরছাড়া করেছিল, সাহাবীদের অত্যাচার করত এবং রাসূল (সাঃ) কে ও তারা একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করেছিল। মুসলিমদের মনে তখন এ কাফেলাটি আক্রমণ করে তাদের চুরিকৃত অথ্র্সম্পদের কিয়দাংশ ফেরত পাবার চিন্তা উদিত হয়, কিন্তু এ ধরণের অপারেশনের পথে বাধা ছিল সে সময়টি ছিল রযব মাস, যে মাসে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া ছিল হারাম। অনেকক্ষণ ভেবে দেখার পর, মুসলিমদের সেই ছোট্ট দলটি তাই করার সিদ্ধান্ত নেয় যা ইতিহাস এবং পরিস্থিতির বিচারে সমর্থনযোগ্য, তারা সে কাফেলাটি আক্রমণ করেন এবং তাদের হারানো কিছু সম্পদ পুনরুদ্ধার করেন।

এই ঘটনা রাসূল (সাঃ) কে অস্বস্তিকর পরিস্থিতে ফেলে দেয়। এই ঘটনাকে পুঁজি করে এবার মুশরিকরা সমাজে হৈ চৈ বাঁধিয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে জনসমর্থন

আদায়ের সুযোগ পায়। তারা বলে বেড়াতে থাকে মুসলিমরা যুদ্ধের ঐশ্বরিক রীতি লঙ্ঘন করেছে, তারা উগ্র, তারা জঙ্গী, তারা রক্তপিপাসু যুদ্ধবাজ; তারা শান্তি ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এবং এ ধরণের নানান কথা। এক পর্যায়ে গিয়ে ইবন জাহশ ও তার বাহিনী কর্তৃক ক্যারাভান আক্রমণের ঘটনায় মুসলিমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করে। অবশেষে, আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন এবং নিশ্চিত করেন, হ্যাঁ, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করার নিষিদ্ধ, তবে, তার থেকেও নিকৃষ্ট হল মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে এতদিন ধরে যা কিছু অন্যায় করে আসছে। এবং এর মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে কেন্দ্র করে কুরাইশদের যে শোরগোল তাকে নিস্ফল হয়ে যায়।

বর্তমানকালেও এই ধরণের পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে সে ব্যাপারে এই আয়াত আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষা হল, ইসলামের শত্রুরা কিছু ঘটনাকে পুঁজি করে ফায়দা লুটবার চেষ্টা করে যা আমাদেরকে রক্ষণাত্মক অবস্থানে ঠেলে দেয়। কিন্তু আমাদের উচিত রক্ষণাত্মক না হয়ে ও কৈফিয়ত দেয়ার চেষ্টা না করে বরং তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য আক্রমণ করা। ইব্নে জাহশের অনুচিত কাজটিকে তারা শঠতাপূর্ণ উপায়ে এমন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সবার সামনে তুলে ধরেছে, যে তাদের নিজেদের সব অপকর্ম এর নীচে চাপা পড়ে গেছে, যেখানে কিনা তাদের অন্যায় ও অপকর্মই এই ঘটনার মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। তাদের এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার জবাবে আল্লাহ মুসলিমদেরকে রক্ষণাত্মক হতে বলেননি, তাদের সামনে কৈফিয়ত পেশ করতে বলেননি, বরং আল্লাহ মুসলিমদেরকে আদেশ করেছেন তারা যা কিছু অপকর্ম করেছে তা তাদের সামনে তুলে ধরতে। এখানে মুসলিমদের আচরণটা হবে এমন, "এক্সকিউজ মি? তুমি কাকে তুমি সন্ত্রাসী, উগ্রপন্থী বলছ? তুমি নিজে কি করে এসেছে আমাদের সাথে, সে ইতিহাসের দিকে আগে লক্ষ্য কর!"

এই যমানায় এসেও মুসলিমদেরকে এই ধরণের পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। যখনই আমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা এবং এই ধরণের আরো অতি পরিচিত কিছু অভিযোগের সামনে তাক করা হয়, তখন অধিকাংশ মুসলিম, তাদের নিয়তও হয়তো ভাল, তারা রক্ষণাত্মক অবস্থান নিয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যাতিব্যস্ত হয়, "দেখুন অল্প কিছু মানুষের কাজের জন্য আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে দেওয়া যায় না", "আমরা শান্তিকামী মুসলমান", "ইসলাম নিরীহ মানুষ

হত্যা কোনক্রমেই সমর্থন করে না", ইত্যাদি। হতে পারে তারা এসবের সাথে মোটেও জড়িত ছিল না, কিন্তু আগ-বাড়িয়ে এসব কথা বলে নিজেদের ইমেজ ক্লিন রাখার চেষ্টা পরাজিত মানসিকতার একটি লক্ষণ, যা পশ্চিমা মুসলিমদের একটি সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমারা এভাবে আমাদের জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে, তারা চায় আমরা নমনীয় হই, কৈফিয়ত ও আত্মরক্ষাসুলভ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করি, এর মাধ্যমে তারা চায় নিজেদের হাতে গড়া হিংস্র ও রক্তাক্ত ইতিহাস আড়াল করতে। এ কারণেই, এই আয়াতটি আমাদের শিক্ষা দেয়, কাফিরদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নমঃনমঃ হয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার এই বেদনাদায়ক মানসিকতা যেন আমরা পরিত্যাগ করি, বরং তাদেরকে তাদের অপকীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে ঘায়েল করি। আর তাদের অপকীর্তির উদাহারণ ভুরি ভুরি।

যেমন করে এই আয়াতে মুসলিমদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে কুরাইশদের অপকর্ম ও অন্যায়ের স্বরুপ উন্মোচন করতে যাতে করে তাদের গর্জন স্তিমিত করে দেওয়া যায়, তেমনি আমাদের উচিত, আজকে যারা ইসলামের শত্রু, তাদের সীমাঙ্ঘন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা, এবং যখনই তারা আমাদেরকে বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বা উগ্রপন্থার অভিযোগ তুলে আঙুল তাক করার ধৃষ্টতা দেখাবে এবং নিজেদের পরম হিতৈষী শান্তিকামী হিসেবে দাবি করবে, তখন আমরা তাদের কুকীর্তির ইতিহাস উন্মোচন করব।

আমাদের নেটিভ আমেরিকানদের গণহত্যার ইতিহাস সম্বন্ধে জানা উচিত। কলম্বাস আসার পূর্বে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি, কিন্তু ইউরোপিয়ান হানাদাররা বর্তমান আমেরিকা জুক্তরাষ্ট্রের এই আদি অধিবাসীদের কচুকাটা করে তাদের সংখ্যা নামিয়ে আসে ১ কোটি থেকে ১০ লক্ষেরও নীচে।

আফ্রিকার দাসদের ইতিহাস নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করা উচিত। সেখানে ৫০ মিলিয়ন মানুষ তাদের জীবন দিয়েছে দাস-বণিক ও উপনিবেশ স্থাপনকারীদের হাতে। এটি সুদূর ইতিহাসের ঘটনা নয়, এটি ঘটেছিল সেই যুগে, যে যুগকে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার সূচনাকাল হিসেবে ধরা হয়। কোন দেশ ছিল এই নিষ্ঠুরতার পেছনে? পশ্চিমা ইউরোপ এবং আমেরিকা, যাদের কিনা সবচেয়ে "সভ্য" জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়।

আমাদের মেক্সিকান-আমেরিকান যুদ্ধের ইতিহাস জানা উচিত, এবং “manifest destiny” এর অর্থ জানা উচিত। (manifest destiny হল এই নিয়তিতে বিশ্বাস করা যে, আমেরিকান সৈন্যরা বিশ্বের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে, বস্তুত এই প্রোপাগান্ডার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মনে "আমেরিকা অপরাজেয়"-এমন একটি ধারণা জন্ম দেওয়া)।

১৯ শতকের শেষদিকে আমেরিকান দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিপিনোদের বিদ্রোহের কাহিনী সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। আমাদের জ্ঞানের পরিধিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে হিরোশিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বিস্ফোরণের ঘটনা। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ মুহুর্তের মাঝে ছাই হয়ে যায় এই বোমার কবলে পড়ে। এদের সবাই ছিল বেসামরিক লোক, তারা যে যার মত কাজ করছিল। ইতিহাসে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের এটিই একমাত্র ঘটনা, এবং নির্মম বাস্তবতা এই, যারা সেইদিন নিজেরা পারমাণবিক বোমা ফাটিয়েছিল, তারাই আজকে হর্তা-কর্তা সেজে বিশ্বব্যাপী লেকচার দিয়ে বেড়ায় যার-তার হাতে যেন এই পারমাণবিক বোমা চলে না যায়। (দেখুন, জন হেরেসির “হিরোশিমা”)

ল্যাতিন আমেরিকা, বিশেষ করে এল সালভাদর, চিলি, পানামা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, গ্রেনেডা এবং গুয়েতমালায় আমেরিকা যুক্তরাষ্টের হস্তক্ষেপ করার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা উচিত। হাওয়ার্ড যিন এর বইগুলো সেক্ষেত্রে ভালো কাজ দিতে পারে।

আমাদের ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের ইতিহাস এবং তৎপরবর্তী আমেরিকা-নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ কর্তৃক ইরাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ইতিহাস জানতে হবে। এই অবরোধের মাধ্যমে ইরাকে খাদ্য-পানি-ঔষধ্পত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিশুদেরকে অনাহারে এবং ঔষধসেবা থেকে বিরত রাখা ছিল যুদ্ধেরই একটি কৌশল। ১৯৯৬ সালে, “৬০ Minitues” নামের একটি অনুষ্ঠানে, ম্যাডেলিন অলব্রাইট (আমেরিকার প্রথম মহিলা সেক্রেটারি অফ স্টেট), আমেরিকার পক্ষ থেকে নিশ্চিত করেন যে তারা মনে করেন, ইরাকে ৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যু তাদের যথার্থ পাওনা।

১৯৯৩ সালে আমেরিকা কর্তৃক সোমালিয়া আক্রমণের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে, যেখানে প্রায় ২০০ সোমালিকে তারা হত্যা করেছিল।

আমেরিকা কর্তৃক ইসরাইলকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের খুঁটিনাটি জানতে হবে, তাদের এই সহায়তার স্বরুপ প্রকাশ পেয়েছে প্রতিটি বুলেট, মিসাইল, বুলডোজার এবং যুদ্ধবিমানে, যেগুলো দিয়ে ফিলিস্তিনের প্রতিনিয়ত আমাদের ভাই-বোনদের হত্যা করা হয়। (পড়ুন নরম্যান ফিনকেলস্টিনের বইগুলো)

আমাদের জানতে চাওয়া উচিত, কীভাবে তারা আমাদেরকে সন্ত্রাসী ডাকার আস্পর্ধা দেখায় যখন তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে আমাদের দু-দুটো দেশে আগ্রাসন চালিয়েছে, জবরদখল করেছে করেছে এবং বম্বিং করেছে।

মনোবিজ্ঞানের একটি ধারণা আছে, যাকে বলা হয় psychological projection। এই ধারণামতে, যখন কেউ কোন অপকর্মের দায়ে দোষী, সে নিজের বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেতে নিজের উপর থেকে সকলের মনযোগ সরিয়ে নিতে চায় এবং অন্য কারো কাঁধে নিজের দোষ চাপিয়ে বাঁচতে চায়। আজকের দিনে আমাদের শত্রুদের সম্ভবত এই রোগেই ঘরেছে। যাই কিছু হোক, আল্লাহ আমাদেরকে এই আয়াতে শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে আমরা তাদের অপপ্রচারে জবাব দেব (এবং কিভাবে দেব না)।

তারিক মেহান্না

প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি

আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮

জুন ১৮, সকাল ৯টা ২২ মিনিট।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২১৪

# সত্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা

কাল পতাকা

Senior Member

১১-১৯-২০১৫

বিসমিল্লাহির রাহামানির রাহিম

আল্লাহতা'আলা সূরা আলে-ইমরানের ৩৫ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

"এবং যখন 'ইমরানের স্ত্রী বললোঃ হে আমার রব! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম..."

একবার কারাগারের এক ধর্মযাজক আমাকে বলেছিলঃ "যতক্ষণ না একজন ব্যক্তি নিজের জীবন আর আরাম-আয়েশের চাইতে সত্যকে বেশি ভালোবাসবে ও প্রাধান্য দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।" সূরা আলে-'ইমরানের পুরোটাই হলো এই সত্যের জন্য আত্মত্যাগের বিবরণ। সূরাটি বরাবর দু'শো আয়াত দীর্ঘ, কিন্তু এতে বর্ণিত হয়েছে মাত্র দুইটি কাহিনী- প্রথম অর্ধেকে একটি কাহিনী, আরেকটি শেষের দিকে। যদিও দু'টি কাহিনীর মাঝে রয়েছে ৭০০ বছরের সুবিশাল ব্যবধান, তবুও ঘটনাদুটো খুব চমৎকারভাবে সমগ্র সূরাকে এক সুতোয় গেঁথেছে - আর তা হলো দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগ, দ্বীনের জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়া, এমনকি নিজ পরিবারকেও।

প্রথম কাহিনীটি হলো 'ইমরানের পরিবারের গল্প, যার নামে এই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে এমন এক পরিবারের কথা যারা সত্যকে প্রচার করতে ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে তাদের সবগুলো প্রজন্মকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলঃ 'ইমরান ও তার স্ত্রী, তাদের কন্যা মারইয়াম (কুমারী ম্যারি), তাঁর চাচা যাকারিয়্যা ও তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া (জন দ্যা ব্যাপটিস্ট), এবং মারইয়ামের আপন সন্তান 'ঈসা (খ্রিস্টানরা যাকে যীশু খ্রিস্ট নামে অভিহিত করে)। আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে এই পরিবারটির ত্যাগের ইতিহাসের শুরু আজ হতে প্রায় ২০০০ বছরেরও আগে, যখন 'ইমরানের স্ত্রী আল্লাহর কাছে আলোচ্য আয়াতে

উল্লেখিত মানতটি আল্লাহর কাছে পেশ করেছিলেন। এবং 'ইমরান পরিবারের এই ত্যাগের ধারা অব্যাহত থাকবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না 'ঈসা (আ) শেষ যমানায় আবারো আবির্ভূত হচ্ছেন, এবং চূড়ান্ত তাওয়াঘিত (দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজ) কে অপসারণ করে ফেলছেন এবং সমগ্র বিশ্ব শরীয়াহ আইন দ্বারা শাসন করছেন।

সূরাতে বর্ণিত দ্বিতীয় কাহিনীটি আরেকটি পরিবারকে ঘিরে, যে পরিবারটি তাদের সবকিছু ঢেলে দিয়েছিল আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে। আমরা জানি, উহুদের যুদ্ধে একদিনে সত্তর জন মুসলিম মুশরিকদের হাতে শহীদ হন। বনী-দিনার গোত্রের এক মহিলার পরিবারের সকল পুরুষ সদস্য এই যুদ্ধে শহীদ হন। সেই মহিলা স্বামীহারা হলেন, তাঁর বাবা, ভাই সবাইকে হারালেন সেই একদিনে। হুযাইফাহ বিন আল-ইয়ামান তাঁর পিতার সাথে উহুদে গিয়েছিলেন, নিজের চোখের সামনেই জিহাদের ময়দানে বাবাকে শহীদ হয়ে যেতে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিরে আসার পথে হামনাহ বিনত জাহশের সাথে তাঁর দেখা হলো, তিনি (সা) তাকে জানালেন যে তাঁর ভাই 'আবদুল্লাহ, তাঁর চাচা হামযা বিন 'আবদুল মুত্তালিব, ও তাঁর প্রিয়তম স্বামী মুস'আব ইবন উমাইর সকলেই ঐদিন শহীদ হয়ে গেছেন। ইমরানের পরিবারের মতো একইভাবে এই পরিবারগুলিও কেবলমাত্র তাওহীদ ও ঈমানের পতাকাকে সমুচ্চ রাখতে যেয়ে নিজেদেরকে পুরোপুরি বিলিয়ে দিয়েছিল।

আর আমরা পরবর্তী যমানায়ও অনুরূপ ঘটনা দেখতে পাই যখন একই পরিবারের একাধিক প্রজন্ম দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগের এই অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত 'আলিম ইবন তাইমিয়্যাহ-র বাবা ও দাদা দু'জনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রখ্যাত আলেম ছিলেন (তাঁর দাদার রচিত "মুনতাক্বা আল-আকবার" গ্রন্থটি আশ-শাওকানির "নাইল আল-আওতার" গ্রন্থের বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত হয়)। অষ্টদশ শতাব্দীর বিখ্যাত সংস্কারক মুহাম্মদ বিন 'আব্দুল ওয়াহাবের উত্তরসূরীরা তাঁর তাওহীদ প্রচারের মিশন অব্যাহত রাখেন (যাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর নাতী সুলাইমান, যিনি সর্বপ্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা সহকারে "কিতাব আত-তাওহীদ" এর উপর গ্রন্থ রচনা করেন), এবং এরকম রয়েছে আরো অনেকে। আপনি কুতুবদের মাঝেও এমন পরিবারের দেখা পাবেন যেখানে একটি পুরো প্রজন্ম কেবল দ্বীনের তরে বেঁচে ছিলেন (সায়্যিদ, তাঁর ভাই মুহাম্মদ,

এবং বোন হামিদা ও আমিনা, তাঁরা সকলেই একই সময়ে কারাবন্দী হয়েছিলেন)।

কতই না চমৎকার হতো যদি যুগ যুগ পরে দ্বীনের জন্য ত্যাগের বীরত্বগাঁথা বর্ণনার সময় আমাদের আপন পরিবার, আমাদের আপন বংশধরদের কথাও এভাবে স্মরণ করা হতো! তবে হ্যাঁ, এই ত্যাগের শুরু সবসময়ই হয় একজন ব্যক্তির নিজেকে দিয়েই।

طارق مهنا

তারিক মেহান্না

প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি

আইসোলেশন ইউনিট #১০৮

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২২৭

# দ্বীনের জন্য থাকা চাই ঐক্য

কাল পতাকা

Senior Member

১১-২৫-২০১৫

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সূরাহ আলে 'ইমরানের ১০৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

"এবং তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিভক্ত হয়ে যেও না..."

একতাবদ্ধ থাকা এবং এর গুরুত্ব নিয়ে কিছু নিজস্ব চিন্তাঃ একবার কয়েকজন ভাই মিলে এক বিশাল লেকে বেড়াতে গেছি, উদ্দেশ্য ভেলায় চড়ব (rafting)। সব মিলিয়ে মোট চারটি ভেলা, দুইজনের জন্য একটি করে। সকলের গন্তব্য এক, লেকের শেষ পাড়ে পৌঁছানো, তবে যাত্রাপথ হবে ভিন্ন। আমাদের কিছু ভাই ব্যাপারটিকে হেলাফেলা করল, দেখা গেলো তাদের কিছু বৈঠা মাঝপথেই পানিতে পড়ে গেছে। শেষমেষ অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, কয়েকটি ভেলা কেবল একটি বৈঠার উপর ভরসা করে ভেসে চলেছে।

কিন্তু হঠাৎ আবহাওয়া একেবারে বদলে গেলো। ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল, চারপাশ হিমশীতল হয়ে গেল। এরই মাঝে আবার একটি ভেলায় ফুটো হয়ে গেছে, বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা পানি গলগল করে ভেতরে ঢুকে পড়তে শুরু করল। সবার টালমাটাল অবস্থা! প্রতিটি ভেলা যে-যার-মতো করে তীরের একটি বিশেষ অংশে ফিরে যাবার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত, সেখান থেকে মূল বেইসে অর্থাৎ যাত্রাস্থলে হেঁটে ফিরে যাবার একটি ফাঁকা পথ আছে। কিন্তু বাতাসের প্রচণ্ড ঝাঁপটায় কোনভাবেই সেখানে পৌঁছতে পারছি না, একবার এদিকে ঠেলে নিচ্ছে তো আরেকবার ওদিকে। আর একটামাত্র বৈঠার শক্তি দিয়ে এই বাতাসের সাথে পেরে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার!

প্রায় তিন ঘণ্টা এভাবেই কেটে গেল। সবাই লেকের ভিন্ন ভিন্ন কিনারায় বাজেভাবে আটকা পড়েছি। তীরের এক এক কোণা থেকে ডাক ছেড়ে একে অপরের উদ্দেশ্যে

চিৎকার করতে লাগলাম। আমাদের মাঝের এক বুদ্ধিদীপ্ত ভাই বলে উঠলোঃ “যদি আমরা একা একা তীরে পৌঁছতে না পারি, তাহলে আসো সবাই মিলে একসাথে চেষ্টা করি!” যেই বলা সেই কাজ! আমরা সবাই তার প্ল্যানমাফিক লেকের মাঝামাঝি একটা স্থানে ভেলাগুলোকে নিয়ে আসলাম, একটির সাথে আরেকটি লাগিয়ে একটি ছোট্ট কাফেলার মতো তৈরি করলাম, আর তারপর যাদের কাছে বৈঠা ছিল তারা সবাই ঐকতানে বৈঠা বাইতে শুরু করলো। পনেরো মিনিটের মাথায় আমাদের সেই চার-ভেলার কাফেলা একটি একক ভেলা হিসেবে তীরে যেয়ে ঠেকলো। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা সবাই এই শিক্ষাগ্রহণ করলামঃ

আমরা যখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলাম, তখন বাতাসের প্রবল বেগ সহজেই আমাদেরকে কাবু করে রেখেছে, তীরে পৌঁছানোর জন্য নিদেনপক্ষে যে শক্তিটুকু দরকার তাও আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট রাখে নি। কিন্তু যেই না আমরা পরস্পর সংযুক্ত হলাম, আমাদের প্রত্যেকের সম্মিলিত শক্তি কে দমকা হাওয়া ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। যখন ভেলাগুলো পরস্পর আলাদা ছিল, তখন সেগুলোর সাথে ছিল একটি বৈঠা, এক কথায় সেগুলো কোন কাজেই আসে নি। কিন্তু আমরা একসাথে জড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বৈঠা একটি বড় কাফেলার একটি অংশে পরিণত হলো, আর সেগুলো একতালে চালনার মাধ্যমে আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম, যা একা একা একটি ভেলা দিয়ে করা সম্ভব হয় নি।

যদি আমরা একসাথে মিলিত না হতাম, তাহলে জনমানবহীন সেই বিশাল লেকে বাতাসের তোড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে কে কোথায় পড়ে থাকতাম! তীরে ভিড়তে পারতাম না। সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ না থাকলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোটা এমনই দুঃসাধ্য। তাই দ্বীনের জন্য থাকা চাই ঐক্য।

طارق مهنا

তারিক মেহান্না

প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি

আইসোলেশন ইউনিট #১০৮

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৬০

## উম্মাহর ভোরের-পাখিদের তুমি বরকত দাও!

কাল পতাকা

Senior Member

১১-২৯-২০১৫

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল্লাহ তা'আলা সূরাহ আলে-ইমরানের ১২১ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

"আর স্মরণ করুন আপনি যখন ভোরবেলায় আপনার আপনজনদের কাছ থেকে ভোরবেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের ঘাটিসমূহে মোতায়েন করলেন..."

উহুদের যুদ্ধ নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া প্রায় ৬০টি আয়াতের মধ্যে এ আয়াতটি-ই প্রথম। এ আয়াতে বলা হচ্ছে কীভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ পর্বতে মুজাহিদীনদের সংগঠিত করার জন্য ভোরবেলাকে বেছে নিয়েছিলেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হলো সময়ের উল্লেখ - আল্লাহ ﷻ সুনির্দিষ্ট ভাবে "ভোরবেলা" কথাটি বলে দিয়েছেন। কিন্তু কেন? আসুন একটু চিন্তা করে দেখি...

ভোরবেলা বা দিনের সবচেয়ে প্রথম ভাগ হলো কাজ সেরে ফেলার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সময়। শাকর বিন ওয়াদা'আ আল-গমিদী বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "হে আল্লাহ! আমার উম্মাহর ভোরের-পাখিদের তুমি বরকত দাও!" আল্লাহর রাসূল ﷺ যখনই কোনো সেনাবাহিনী পাঠাতেন বা অভিযান পরিচালনা করতেন, তিনি তা করতেন একেবারে দিনের প্রারম্ভে। শাকর বিন ওয়াদা'আ নিজেও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি তার কাফেলা সবসময় সকালবেলায় প্রেরণ করতেন, যার ফলে তার ছিল অঢেল প্রাচুর্য।

সত্যি বলতে কী, কুর'আনের মধ্যে একটু ঘেঁটে দেখলে দেখা যাবে যে বহু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা দিনের প্রারম্ভে সংঘটিত হয়েছে।

এই ভোরবেলাতেই আল্লাহ ﷻ লুতের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সূরাহ হুদের ৮১ নম্বর আয়াতে এই ঘটনার কথাই বর্ণিত হয়েছেঃ

"নিঃসন্দেহ তাদের নির্ধারিত সময় হচ্ছে ভোরবেলা। ভোরবেলা কি আসন্ন নয়?" আর সূরাহ আল-হিজরের ৬৬তম আয়াতঃ

"আমি লূতকে এই বিষয়ে জানিয়ে দিলাম যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমুলে বিনাশ করে দেয়া হবে।"

এবং সূরাহ আল-ক্বমারের আয়াত ৩৮তম আয়াতঃ

"আর নিশ্চিতভাবে প্রত্যুষে তাদেরকে নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনেছিল।"

এভাবে বার বার "ভোর" কথাটি কুরআনে এসেছে। সূরাহ আশ-শু'আরার ৬০-৬৬ আয়াতেও আমরা দেখি যে, ফেরাউন ও তার সৈন্যদলের ধাওয়া করার পর, এই সূর্যোদয়ের সময়েই মূসা (আ) সমুদ্র বিদীর্ণ করেছিলেন।

এই ভোরবেলার ফজরের ফারদ সালাতের পূর্বে আদায় করা দু' রাকআত সুন্নাহ সালাতের কথা বলতে যেয়েই আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেনঃ "এটি আমার নিকট দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার চাইতেও বেশি প্রিয়।" সত্যিই! তাঁর কাছে তা এতোটাই প্রিয় ছিল যে তিনি ﷺ কোনদিনও এ দু'রাকআত সালাহ বাদ দেন নি। আর এই ফজর সালাত-ই যখন জামাতের সাথে কায়েম করা হয়, তার বর্ণনা নিয়ে নবীজি ﷺ বলেনঃ "এ নামাজ বান্দাকে আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের ছায়াতলে নিয়ে আসে।"

আসলে আপনি নিজের দিকে লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন, যে দিনগুলোতে আপনি ফজরের পর থেকেই কাজকর্ম শুরু করে দেন, সে দিনগুলি অন্যান্য দিনের চাইতে অনেক বেশি কার্যকর। আর যে দিনগুলিতে ফজর পড়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুম দেন, সে দিনগুলো কখনোই এত কর্মমুখর হয় না। সকালে উঠে মর্নিং ওয়াকে যাওয়া থেকে শুরু করে তাড়াতাড়ি অফিসে পৌঁছনো, ক্লাসের পড়াটা তৈরি করে ফেলা, কুর'আন মুখস্থ, সকাল থেকে ভ্রমণ করা, কিংবা সকালে উঠে নাস্তা খাওয়া - এসবের সাথে তুলনা করুন সেই দিনগুলির কথা যখন পুরো সকালটা আপনি কিছু না করেই কাটিয়ে দেন - ঘুম থেকে উঠে কেবলমাত্র সকালের নাস্তা সারতে সারতেই বেলা বারোটা বেজে যায়। এই দু' ধরণের দিনের প্রোডাক্টিভিটি কি কখনো সমান? তফাৎটা তো দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার! আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবাদের সুন্নাহ ছিল সকাল সকাল কাজ শুরু করে

দেয়া, এমনকি জিহাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি, যেখানে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন অত্যধিক।

সুতরাং ফজর সালাতের পর অলসতা ঝেড়ে ফেলুন, জড়তা কাটিয়ে জেগে ওঠার চেষ্টা করুন। আর এসময়টিকে কাজে লাগান। আপনার দৈনন্দিন কাজগুলো আগে আগে সেরে নিন। সেই দলের সাথে যোগ দিন যাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আখ্যায়িত করেছেন "ভোরের-পাখি" হিসেবে, যাদের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে বরকতের দু'আ চেয়েছেন! আর জেনে রাখুন সকালে করা সবচেয়ে উত্তম, সজীবতাময় ও উপকারী কাজটি হলো আল্লাহর স্মরণে বিজড়িত হওয়া। নবীজি ﷺ তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছিলেনঃ "ইসমাঈল (আ) এর উত্তরসূরীদের মধ্য হতে চারজন দাস মুক্ত করার চাইতে ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর স্মরণে রত কোন দলের সাথে বসে থাকা আমার নিকট অধিক প্রিয়।"

ভোরে ওঠার কার্যকারিতা নিয়ে তো অনেক কথাই হলো, তবুও একটি বিষয় বলা বাকি রয়ে গেছে। আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা দিনের প্রথম ভাগের নি'আমত সম্পর্কে ভালো ভাবেই অবগত, যারা সকাল থেকে শুরু করে সমগ্র দিন কাজে লাগাতে চান, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিদিন সকালে শরীরে যে দুর্বলতা আর জড়তা জেঁকে বসে, তা কোনভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারেন না। আমার মতো আরো অনেকেই মোটেও "ভোরের-পাখি" নন। তাহলে কীভাবে আমরা নিজেকে বদলাবো? কোথায় খুঁজে পাবো সেই অপরিসীম শক্তির ভাণ্ডার যা দিয়ে সারাদিনে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাজ সম্পাদন করতে পারা যায়?

প্রথমত, আমাদের নিজেদেরকে এমন একটি নিয়মের মাঝে নিয়ে আসতে হবে যেন আমরা ইশার পর কর্মকাণ্ডের সংখ্যা কমিয়ে আনি, আর জলদি জলদি শুয়ে পড়ি। সহীহ হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে - ইশার সালাতের পরে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা এবং ইশার পূর্বে ঘুমানো - এ দু'টি কাজের ব্যাপারে রাসূল ﷺ অত্যন্ত জোরালোভাবে আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করেছেন। কেননা এই দু'টো অভ্যাস ত্যাগ করলে আমরা দ্রুত ঘুমাতে পারবো। আর গাঢ় একটি ঘুমের পরে ঝরঝরা দেহ ও মন নিয়ে পরদিন সকালে জেগে উঠবো।

দ্বিতীয়ত, ভোরের কিছু আগে উঠে ইবাদতে নিয়োজিত হওয়ার বিষয়টি আমাদের মন ও মেজাজের উপর সরাসরি ছাপ ফেলে। বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"যখন তোমাদের কেউ ঘুমিয়ে পড়ে, শয়তান তোমাদের (মাথার) পশ্চাদাংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, "তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব শুয়ে থাকো। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে একটি গিঁট খুলে যায়। অত:পর যদি সে ওজু করে আরেকটি গিঁট খুলে যায়, তারপর যদি সে নামাজ পরে আরেকটি গিঁট খুলে যাবে। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথা সে সকালে উঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য সহকারে।" [বুখারীঃ ১১৪২, মুসলিমঃ ৭৭৬]

এসব কিছু চিন্তা করার পর যখন উপরের আয়াতটির দিকে আবার তাকাই তখন বুঝি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা কেন বিশেষ ভাবে সময়ের উল্লেখ করেছেন। এই একটি আয়াত-ই আমাদের দিনগুলোকে আরো বেশি কর্মতৎপর করে তুলতে পারে, ইনশা আল্লাহ..।

طارق مهنا

তারিক মেহান্না

প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি

আইসোলেশন ইউনিট - সেল # ১০৮

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৮২

## যদি মুমিন হও , তোমরাই জয়ী হবে

কাল পতাকা

Senior Member

১২-০৬-২০১৫

সূরা আল ইমরানের ১৩৯ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

**"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।"**

উক্ত আয়াতটিই আমাদের সময়ের স্লোগান হওয়া উচিত।

কিছু পশ্চিমা দা'ঈ তাদের লেকচারে হুদায়বিয়ার সন্ধি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাক্কী জীবন এসব নিয়ে এমনভাবে কথা বলেন যাতে মনে হয় মুসলিম উম্মাহর চলমান অধঃপতিত ও দুর্বল অবস্থাকেই যেন তারা নিজেদের নিয়তি হিসাবে মেনে নিয়েছেন। এমন একটা ভাব যেন এই অবস্থা থেকে উত্তরণে আমাদের কিছুই করার নেই। এই চিন্তাধারাটি আমাকে ক্ষুব্ধ করে। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, ICNA এর এক কনভেশনে একজন দা'ঈ ইসলামের কিছু স্পর্শকাতর বিষয় উল্লেখ করে মন্তব্য করলেন, "এককালে আমরা এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারতাম!"। সাথে সাথে তিনি ও উপস্থিত অন্যান্যরা উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। আমি দর্শকসারিতে বসে আনমনে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ভাবছিলাম, "আশ্চর্য! আপনি আপনার লেকচারেইসলামের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারছেন না এতে হাসির কী আছে! এর থেকে দুঃখজনক ব্যাপার আর কী হতে পারে যে, ইসলামের একজন দা'ঈ হয়েও আপনি আজকে একজন অনুগত ভৃত্যে পরিণত হয়েছেন?" তখন এই আয়াতটি আমার কানে বাজছিল।

কিন্তু এই আয়াতটিই কেন? কারণ উহুদের যুদ্ধের এক ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত মুহূর্তে এই আয়াতটি নাযিল হয়। সাহাবীদের অনেকেই তখন মনোবল হারিয়ে ভেঙে পড়েছিলেন। তাদের মনে লুকিয়ে থাকা ভয় এবং দুর্বলতা- এই দুটি সহজাত অনুভূতির দিকে নির্দেশ করে এই আয়াতটি বলছে, ভীত হয়ো না, ভেঙে পড়ো

না। এই আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকাটাই প্রকৃত বিজয়, যুদ্ধক্ষেত্রের পরাজয় তো বাহ্যিক পরাজয়, এটি সাময়িক ব্যাপার। কাজেই মু'মিনদের হতাশ বা দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বা নিজেদের দুর্বল ভাবার কোনো অবকাশ নেই।

আজকের দিনেও এই আয়াতটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আয়াতটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমাদের বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং শক্তিহীনতা সত্ত্বেও আমাদের নিজেদেরকে দুর্বল ভাবার কোনো কারণ নেই। কেননা সত্যিকারের যুদ্ধ হল মনস্তাত্ত্বিক। মন এবং মগজই হচ্ছে যুদ্ধের আসল ক্ষেত্র। যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত ঈমানধারী মুসলিম আছে ততদিন আমরা দুর্বল নই। বাহ্যিকভাবে আমাদের পরিস্থিতি যতই নড়বড়ে হোক না কেন।

যদি কোনো ব্যাক্তি, সমাজ, জাতি অথবা উম্মাহ বৈষয়িক দিক থেকে নিরাপদ ও সমৃদ্ধশালী হয় অথচ তার নিজস্ব চেতনা বা ঈমান-আক্বীদার সাথে আপস করে ফেলে, তবে সে বাহ্যিক সফলতা নিরর্থক। আবার, বাহ্যিক সাফল্যের পরোয়ানা করে যদি ঈমানের ব্যাপারে আপসহীন থাকাযায়,তখনও বাহ্যিক সাফল্য গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে বলা হয়ে থাকে, যখনই কোনো সাম্রাজ্য তার নিজস্ব চেতনা ও মূল্যবোধের সাথে প্রতারণা করে তখনই তার পতন ঘটে। আর তাই উহুদে সামরিকভাবে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদেরকে আল্লাহ জয়ী বলেছেন, কেননা তারা নিজেদের চেতনা ও বিশ্বাসের উপর ছিলেন বলীয়ান। তাই, আজকে মুসলমানদের সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ যে যুদ্ধে লড়তে হচ্ছে তা হল মতাদর্শের যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক জগতের হৃদয় ও মননের যুদ্ধ (battle for hearts and mind)।

আজকে মুসলিম উম্মাহকে পরাজিত করার লক্ষে কুফ্ফাররা আমাদের মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করছে। তারা দিনে রাতে কাজ করে চলেছে ইসলামের জীবনীশক্তি, আমাদের শক্তির আসল উৎস, "ঈমান" কে আমাদের হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে, যে ঈমান পশ্চিমাদের দাসত্বের কলুষতা থেকে মুক্ত। তারাচায় আমরা যেন নিজেদের দুর্বলতাকে নিয়তি ভেবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিই। এভাবে তারা আমাদের কেবল বাহ্যিকভাবে নয়, বরং অন্তরকেও সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের শেকলে আবদ্ধ করতে চায়। আমাদের উচিত আমাদের এই দুর্বল জায়গাগুলো সারিয়ে তোলা। আমাদের মনে রাখতে হবে,

গোলামির কলুষতা থেকে মুক্ত ঈমান বুকে ধারণ করার কারণেই আল্লাহ সাহাবিদের সম্মানিত করেছেন, যদিও দুনিয়াবী শক্তির বিবেচনায় তারা ছিলেন দুর্বল। আজকেও আমরা একইভাবে সম্মানিত হব, যদি আমরা পশ্চিমাদের দাসত্বের মনস্তাত্ত্বিক বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারি।

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের মনে এই বিষয়টি দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিতে চান যে, বস্তুগতভাবে আমরা যতই দুর্বল হই না কেন, আমাদের হৃদয়ে জেঁকে বসা ঔপনিবেশিক দাসসুলভ মানসিকতার (mental colonialism) কারণসমূহ চিহ্নিত করতে পারলে এবং আমাদের হৃদয় ও মনকে এই হীনমন্যতা থেকে বিশুদ্ধ রাখতে পারলে আমরাও সম্মানিত হব। এই আদর্শিক যুদ্ধজয় তখন অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।

জেলখানাতে আমার কয়েক সেলপাশে 'জো' নামে এক মাদকব্যবসায়ী ছিল। কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতারের আগে সে কেমন করে তার মাদক ব্যবসা চালিয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমাকে জো অনেক গল্প বলেছিল।

গল্পের শেষে জো দুঃখের সাথে বলেছিল, "এখন সরকার আমাদের সাথে ইচ্ছামত যা খুশী করতে পারে।"

আমি তাকে বলেছিলাম, "জো, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, 'তুমি কি তোমার স্ত্রীকে ভালবাসো?'।" সে উত্তর দিল, "অবশ্যই, আমি তাকে ভালবাসি।"

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "মনে কর কর্তৃপক্ষ তোমার উপর অনেক শারীরিক নির্যাতন চালালো। তারা কি তোমার মুখ থেকে এ কথা বের করতে পারবে, 'আমি আমার স্ত্রীকে ঘৃণা করি।'?"

সে বলল, "পারতেও পারে।"

আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদি তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলোকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে তারপরও কি তারা পারবে তোমার হৃদয়ের গভীর থেকে স্ত্রীর প্রতি তোমারভালবাসাকে মুছে ফেলতে?" জো উত্তর দিল, "কখনোই না।"

আমি শেষে বলেছিলাম, "এজন্যই আসলে তারা যা খুশী তা করতে পারে না। কারণ তোমার হৃদয় তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।"

আল্লাহ বলেন,

**“তোমরা হীনবল ও দুঃখিত হয়ো না, বস্তুতঃ তোমরাই জয়ী থাকবে যদি তোমরা মু'মিন হও।” (সুরা আল-ইমরান আয়াত ১৩৫)**

সুতরাং, বাহ্যিক দুর্বলতা সত্ত্বেও সর্বদা অগ্রগামিতা ধরে রাখা সম্ভব। কাজেই দা'ঈদের আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে বারবার ‘মাক্কী জীবন’ আর ‘হুদাইবিয়াহ’র তুলনা দিয়ে দুর্বলতা আর হতাশাকে স্বাভাবিক হিসাবে মেনে নেওয়ার বোধ তৈরি করে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। বরং তাদের উচিত ভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করা। যেভাবে কুরআনের এই আয়াতে আল্লাহ মুসলিমদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে বাহ্যিক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরাই হবে শ্রেষ্ঠ, যদি তারা হীনমন্য না হয়ে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার ইতিবাচক মনোভাব ধরে রাখে। তাই, উক্ত আয়াতটি আমাদের আজকেরদিনের স্লোগান হওয়া উচিত। আমাদের মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার এই একটি আয়াতই যথেষ্ট।

এ বিষয়ে আরও পড়তে চাইলেঃ

• সায়্যিদ ক্বুতুবের লেখা “Milestones” বইয়ের “The Faith Triumphant” অধ্যায়।

• RAND কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত ‘সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম’ [Amazon.com:Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies...]

**طارقمهنا**

**তারিক মেহান্না**

**প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি**

**আইসোলেসন ইউনিট- সেল#১০৮**

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩২৯

## অন্ধ বিশ্বাস: ব্যাক্তিপূজার ইসলামী ছদ্মব

কাল পতাকা

Senior Member

১২-০৭-২০১৫

সূরা আল ইমরানে, ১৪৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

*"আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ কিছু নন! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। অতএব তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? ..."*

কুরআনে হাতেগোণা অল্প কিছু আয়াত আছে, যে আয়াতের শব্দগুলো কোন সাহাবার মুখে প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ কুরআনে ওহী হিসেবে সেগুলোকে নাযিল করেন। এই আয়াতটি তেমনই একটি আয়াত। এটি হল সেই দিনের কথা, যেদিন মুস'আব বিন 'উমায়েরকে উহুদের দিনে মুশরিকরা চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল, তিনি দেখছিলেন রাসূল (সাঃ) কে ও মুশরিকরা ঘিরে ফেলেছে। রাসূল (সাঃ) কে এমন একটি বিপদাপন্ন পরিস্থিতিতে দেখে তিনি নিজেকে নিজে তখন বলে উঠেছিলেন,

**"আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ কিছু নন! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন"**

এই কথাগুলোই পরবর্তীতে সূরা আল ইমরানের আয়াত হিসেবে নাযিল হয়। মুস'আবকে সেদিন মুশরিকরা হত্যা করেছিল, কিন্তু গুজব ছড়িয়ে পড়ে মুস'আব নয়, রাসূলুল্লাহ ﷺকে মুশরিকরা হত্যা করেছে। এই ভুয়া তথ্যটি যখন সাহাবাদের কাছে পৌঁছল তখন তারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে একটি দল এতটাই বিষাদগ্রস্ত পেল এবং মনোবলহীন হয়ে পড়ল যে তারা পুরোপুরি হাল ছেড়ে দিল, কেউ কেউ পালিয়ে মুনাফিক্বদের দলে যোগ দিল। আর কেউ ছিল অনড়, তারা বলল, **"যদি আল্লাহর নবী মারা গিয়ে থাকেন, তবে যে উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ করে গেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধনে আমরাও লড়াই করে যাব"**। তারা শেষ পর্যন্ত দৃঢ়পদ ছিলেন, যেমনটা তারা এ মৃত্যুর সংবাদ শোনার আগেও

ছিলেন। মুশরিক কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় মুসা'আবের মুখ নিঃসৃত এ কথাগুলো সেই লড়াইয়ের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে এবং আল্লাহ কুরআনে এ কথাটি উল্লেখ করার মাধ্যমে মুস'আবের এ কথাটির প্রতি সমর্থন জানান যা ইসলামের সঠিক দা'ওয়াহর অনুসারীদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

কোন কিছু বিশ্বাস করা বা কিছু অনুসরণ করার পেছনে একজন মানুষ বিভিন্ন কারণে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, যেমন মুসলিমদের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি আমরা দেখবঃ

- কিছু মানুষ আছে এমন, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠের দলে থাকতে পছন্দ করে, তারা স্রোতে গা ভাসায় এবং আর দশজনের মত করে চলতে চায়, তারা এমন একটা মানহাজ বা পদ্ধতির অনুসরণ করে যা তার বন্ধু এবং পরিচিতরা মেনে চলছে।

- কেউ কেউ নিজেদের আক্বীদা-বিশ্বাস এবং মানহাজ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকে, একটি ব্যর্থ হলে আরেকটি যাচাই করে, তাদের "এ-সপ্তাহের-সেরা-আকর্ষণ" খুঁজতে ব্যস্ত!

- কেউ কেউ আছে যারা আবেগচালিত, যেমন একটা লেকচার বা প্রেসেন্টেশন দেখে তাদের আবেগ তুঙ্গে উঠে যায় আবার পরে নেমে যায়।

- কেউ কেউ আছে যারা একটি বিশেষ মানহাজ বা পদ্ধতি অনুসরণ করে কোন বিশেষ ব্যাক্তিত্বের প্রতি তার ভাল-লাগার অনুভূতি থেকে।

শেষোক্ত কারণটিই ব্যাখ্যা করে কেন রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর নিছক গুজব শুনেই একদল সাহাবী আশাহত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই আয়াতটি মানবীয় এই দূর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে এবং আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, যদি আমরা আমাদের

হৃদয়কে ইসলামের যে মূল মেসেজ বা আদর্শ, তার প্রতি অনুরক্ত বা আকৃষ্ট না হয়ে যদি আমরা কোন বিশেষ ব্যাক্তি বা দলের প্রতি আসক্ত হই, তবে তুচ্ছ চাপের মুখেই আমরা হার মানব এবং পশ্চাদপসরণ করে বসব। যদিও আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ কে একজন নবী হিসেবে অবশ্যই ভালবাসি কেননা তিনি আমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে ইসলামের বাণী ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও ইসলামের যে শিক্ষাবস্তু তার প্রতি আমাদের ভালবাসা না থাকলে আমরা টিকে থাকতে পারব না।

ইসলামের প্রতি আমাদের ভালবাসা ব্যাক্তিকেন্দ্রিক হওয়া চলবে না, আর সে কারণেই, উহুদের দিনে বেশ কিছু সাহাবী ছিলেন যারা রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর গুজব শুনে পিছপা হননি, বরং বলে উঠেছিলেন, "যদি তিনি মারা যান, তবে যে উদ্দেশ্যে তিনি লড়েছেন, আমরাও সে উদ্দেশ্যে লড়ে যাব", সহজ ভাষায় বললে, "তিনি মারা গেছেন তো কি হয়েছে? তিনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছন আমরা সেটা অনুসরণ করেছি, ব্যাক্তি হিসেবে তাকে আমরা অনুসরণ করি নি, বরং অনুসরণ করেছি একজন নবী হিসেবে। তিনি একজন নবী, এর বেশি কিছু তিনি নন।" আর এ কারণেই, সাত বছর পরে যখন রাসূল ﷺসত্যিই মারা যান, সেদিন আবু বকর ﷺ উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

*"তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদের ইবাদাত করত, (জেনে রাখ) মুহাম্মদ মারা গেছে, আর তোমরা যারা আল্লাহর ইবাদাত কর, (জেনে রাখ), আল্লাহ চিরঞ্জীব এবং তার কোন মৃত্যু নেই"। এরপর তিনি এই আয়াতটি আবৃত্তি করেন। তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে যে, আমরা ইসলামের সত্য আদর্শের কারণে মুসলিম, কোন বিশেষ ব্যাক্তিত্বের প্রতি অনুরাগ বা মোহ থেকে নয়।*

পশ্চিমা সমাজে ব্যাক্তিপূজা অত্যন্ত প্রবল, হোক তা মিউজিক স্টার, মুভি স্টার বা আর যেকোন ধরণের খ্যাতিমান লোক। ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই অভ্যাসটি ইসলামী দা'ওয়াহ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও পর্যন্ত আক্রান্ত করেছে, যেসব প্রতিষ্ঠানে "সুপারস্টার শেখ বা স্কলার" এর একটি কালচারের জন্ম হয়েছে, যা জাহেলী সমাজের "সেলিব্রেটি-পূজা"র বিকল্পরূপে আবির্ভূত হয়ে ব্যাক্তিপূজার যে ধারা তাকে ইসলামী ছদ্মবেশে বজায় রেখেছে। এই ধরণের ধারার বিপদ দ্বিমাত্রিক,

এক, এ ধরণের শাইখ বা 'আলিমের উচ্চারিত যেকোন কথাকে চূড়ান্ত এবং বিতর্কের উর্ধ্বে হিসেবে ধরা হয় যাকে কোনভাবেই চ্যালেঞ্জ করা যাবে না, যদিও ইসলামের সত্য উদঘাটন ও প্রচারের অধিকার কোন বিশেষ দলভুক্ত আলিম বা কোর্স ইন্সট্রাক্টরদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়!

এবং দুই, কোন শাইখ বা নেতার প্রতি যদি তাদের অনুসারীদের গভীর ভক্তি এবং অযাচিত আসক্তি থাকে, তাহলে আরো যে সমস্যাটি হতে পারে তা হল, যদি তারা তাদের অবস্থান থেকে সরে আসে, কিংবা গ্রেপ্তার হয় কিংবা তাদের মৃত্যু ঘটে, তখন তাদের অনুসারী পথের দিশা হারিয়ে ফেলে এবং পিছু হটতে আরম্ভ করে, ঠিক যেমনটা হয়েছিল কিছু সাহাবীর ক্ষেত্রে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর খবর শুনে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন উহুদের ময়দান থেকে।

সমস্যার সমাধান হল একটি মুক্ত, সমালোচক, বিশ্লেষনধর্মী এবং অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী হওয়া, যা আপনার আর সত্যের মাঝে কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না, সে সত্য যেখান থেকেই আসুক না কেন। আপনার এ ধরণের ইতিবাচক মন আপনাকে সত্য গ্রহণে সাহায্য করবে কেবল তা সত্য বলেই, কে সেই সত্য বলছে তা আপনার কাছে আর মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে না। যেমন করে আল-ইমাম আহমাদ বলছিলেন, **"একজন মানুষের জ্ঞানের ঘাটতি থাকে তখনই, যখন সে অন্য কাউকে অন্ধ ভাবে বিশ্বাস করে"।** এবং সম্ভবত এ কারণেই, ইমাম আহমদ তার "মুসনাদ" থেকে হাদীসের ক্লাস নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন এবং তার মতগুলোকে লিখে রাখতে খুব জোরালোভাবে নিরুৎসাহিত করতেন। তিনি চাইতেন তার ছাত্রদের সাথে তার ব্যাক্তিত্ব এবং তার মতামতের প্রতি যেন ভক্তি না হয়, বরং তা যেন হয় কুরআন এবং সুন্নাহর সাথে।

এটা খুবই দুঃখজনক, প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক মুসলিম যারা বেশ উৎসাহী এবং উদ্যমী থাকে, তারা এই আয়াতের মূলভাব হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়, পরবর্তীতে যা হয়, তা হল তারা একের পর এক মানহাজের মাঝে গড়াগড়িতে পতিত হয়। আজকে তারা সালাফি, কালকে সুফী বা আশ'আরি, আরেকটা দিন হয়তো আসবে যেদিন তারা পুরো দ্বীনকেই পরিত্যাগ করে ফেলবে। এর সবকিছুর পেছনে ফিরে তাকালে যে সমস্যাটি আমরা আবিষ্কার করব তা হল, তারা ইসলামের

দা'ওয়াহর পথে তারা প্রবেশ করেছে অত্যন্ত ভাসাভাসা এবং ক্ষণিকের প্রণোদনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। প্রবল দ্রুততার সাথে বারবার নিজেদের রঙ বদলাবার পেছনে যে কারণ তা হল তারা সত্যকে সঠিক কারণের ভিত্তিতে গ্রহণ না করে অন্য ভিত্তি বা পথে গ্রহণ করেছে, যেমন ব্যাক্তিবিশেষের প্রতি অপরিমিত শ্রদ্ধাবোধ কিংবা অন্য কোন কারণে, কিন্তু যে ব্যাপারটি তাদের ঘাটতি ছিল তা হল ইসলামী শিক্ষার বিষয়বস্তুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং গভীর উপলব্ধি না থাকা।

কাজেই, আপনাকে সাবধান হতে হবে যেন কোন ব্যাক্তিবিশেষের প্রতি আপনার অতিভক্তি এবং অপরিমিতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকে। মানুষ বদলায়, এবং তারা মারা যায়। তাই, আপনাকে অধ্যয়ন করতে হবে, ভালবাসতে হবে, এবং ইসলামী দা'ওয়াহর মূল যে মেসেজ, একমাত্র সেটাই আপনাকে আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ করবে এবং প্রেরণা যোগাবে, এবং সাথে অবশ্যই এই দা'ওয়াহর মূল উৎসের প্রতিই আপনাকে আন্তরিক হতে হবে, কেননা, মানুষের মৃত্যু ঘটে, আদর্শের কোন পরিবর্তন বা মৃত্যু নেই।

*طارق مهنا*
*তারিক মেহান্না*

*প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি*

*আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮*

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৩৪

## মনগড়া হিকমাহ নিফাকীর আলামত

কাল পতাকা

Senior Member

১২-০৯-২০১৫

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সূরা আল-ইমরানের ১৫৬ নং আয়াতে বলছেন,

***"হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কুফরি করে এবং তাদের ভাই-বন্ধুগণ যখন বিদেশে সফর করে কিংবা কোথাও যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদের সম্বন্ধে বলে, 'তারা আমাদের কাছে থাকলে মরত না, নিহতও হত না'।"***

এবং ১৬৮ নং আয়াতে বলছেন,

***"...যারা (ঘরে) বসে থেকে নিজেদের ভাইয়ের সম্বন্ধে বলতে লাগলো, আমাদের কথা মত চললে তারা নিহত হত না..."***

উপরের আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যখন তারা উহুদের ময়দানে যুদ্ধ করতে না গিয়ে মুসলিম বাহিনী থেকে বের হয়ে গেলো। তারা যুদ্ধরত মু'মিনদের দেখে মনে মনে ভাবতে থাকলো যে, দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম থেকে দূরে ও নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার মধ্যেই আছে সকল 'হিকমাহ'। অপরদিকে মু'মিনদের যারা দ্বীনকে রক্ষা করা ও বিজয়ী করে তোলার জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে রাজি আছে, তারা যেন আছে ভ্রান্তির পথে! এটাই ছিল মুনাফিকদের চিন্তাভাবনার নমুনা।

সত্যের দিকে মানুষকে ডাকতে গেলে কষ্ট ও বিপর্যয় নেমে আসবেই, এবং এই কষ্ট সহ্য করতে পারাটাই একজন প্রকৃত সত্যান্বেষীর পরিচয়। ইবন আল-কায়্যিম দ্বীনের প্রচারে একজন দা'ঈর প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ স্তরের দিকে আলোকপাত করতে গিয়ে বলছেনঃ *"(দা'ঈর পক্ষে সর্বোচ্চ ত্যাগ হল) আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দিতে গিয়ে যাবতীয় বিপর্যয় ও মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বাধা-বিপত্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য সহ্য করে যাওয়া"*। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা কুরআনের সূরা

আল-আসরে আমাদেরকে দ্বীনের প্রচার ও শিক্ষাদানের পথে সব বাধা-বিপত্তিতে ধৈর্যশীল হতে জোর দিয়ে বলেছেনঃ

**"সময়ের শপথ! মানুষ ভ্রান্তির মধ্যে আছে; কেবল তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করে, সত্যের প্রচারক, আর ধৈর্যধারণে উৎসাহ দান করে।" [সূরা আল-আসর]**

অতএব একজন মুসলিম যেচে পড়ে কষ্ট ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে না সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যদি এমন হয় সত্যপ্রচারের পথে বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন না হয়ে আর কোন উপায় নেই, তবে একজন মু'মিন হাত গুটিয়ে বসে না থেকে স্বেচ্ছায় সে পথেই এগিয়ে যাবে। কেননা আলোচিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন প্রচারের জন্য সকল কষ্ট মেনে নেয়ার এই ইচ্ছাই তার ঈমান ও নিফাকের মধ্যে পার্থক্যকারী।

আরাম-আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়া, নিরাপদ জীবন চাওয়া, এগুলো আমাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং আ'ইশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺএর ব্যাপারে বলছেন, *"তাঁর সামনে যখন দুটো রাস্তা খোলা থাকত, তখন তিনি দুটোর মাঝে সহজটাই বেছে নিতেন, যদি না সেই সহজ পথে আল্লাহর অবাধ্যতা থাকে"*। কিন্তু যখন এমন হত, দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে কুফ্ফারদের কাছ থেকে কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হতেই হবে এবং নিজের আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দিতে হবে, তখন কি তিনি আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দিতেন? নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন।

তিনি বা আর অন্য কোন নবী কি কখনো নিজেদের নিরাপত্তা ও আরাম-আয়েশের কথা ভেবে সত্য প্রচারে পিছু হটেছিলেন? আজকাল ইসলামের অনেক দা'ঈ সত্য গোপন করার পিছনে একটি খোঁড়া যুক্তি খাঁড়া করান যে, *"এটা করলে তাদেরকে অচিরেই শত্রুর হাতে ধ্বংস হতে হবে, বরং এ থেকে বিরত থাকলে আগত দিনগুলোতে তারা দ্বীনের উপকারে আসতে পারবেন*।" নবীদের কেউ কি এসব খোঁড়া অজুহাত দিতেন? কক্ষনো না, একবারও না।

বদরের সেই দিনে রাসূলুল্লাহ(সা) এর কথা স্মরণ করে দেখুন, যুদ্ধের পূর্বে তিনি আল্লাহর কাছে কী ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

*"হে আল্লাহ! মু'মিনদের এই দল যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পরাজিত হয়, তোমার ইবাদাত করার জন্য আর কেউই অবশিষ্ট থাকবে না।"*

অন্য ভাবে বলা যায়, তিনি জানতেন এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ মানে মু'মিনদের জীবন নয়, খোদ ইসলামের অস্তিত্বকেও হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া, আরাম-আয়েশ পরিত্যাগের বিষয়টি বাদই দিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কিছু বিপদের আশংকায় সাহাবীদেরকে নিজেদের মালামাল গুটিয়ে মদীনায় ফিরে যাওয়ার কথা একটিবারের জন্যেও মুখে এনেছিলেন? তিনি এমনটি করেননি, বরং নির্ভীকচিত্তে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন, মুশরিকদের মোকাবেলা করেছেন এবং তাকে পরিপূর্ণ বিজয় দান করে হয়েছিল । এই ঘটনাই সকল পরিস্থিতিতে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দেয়, এবং আমাদের নিজেদের চিন্তার ধরণ কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়।

সমগ্র পৃথিবী আজ পুঁজিবাদীদের 'যার যার তার তার' (every man for himself) চিন্তাধারা দ্বারা বশীভূত, যা একজন মানুষকে তার স্বার্থোদ্ধারের জন্য যেকোন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা মুনাফিকদের মুখেও ঠিক একই ধাঁচের কথা শুনতে পাই, *"সত্য প্রচারের পথে যদি শত্রু পক্ষ হতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, তবে নিজের গা বাঁচিয়ে চল"*। তারা নিজেরা তো সেই পথে যাবেই না, বরং যারা কিনা মু'মিন, নিজেদের দুনিয়াবী আরাম আয়েশের প্রতি যাদের মোহ নেই, আল্লাহর দ্বীনের প্রতিই তাদের ভালবাসা, তাদের ব্যাপারে তারা মুরুব্বিয়ানা ফলাবে, তাদের উপহাস করবে আর তাদেরকে উগ্র ধর্মান্ধ মনে করবে। তাদের মতে জিহাদের ময়দানে "বেঘোরে প্রাণ দেয়ার" কোন মানে নেই, যখন কিনা ঘরে বসে থাকলেই থেকে ত্বাগুতের ছোবল থেকে নিশ্চিন্তে থাকা যায়! দ্বীনের খাতিরে জান-মাল বিলিয়ে দেওয়া এদের চোখে নেহায়েত অপচয় বলে ঠেকে, আর তাই তারা 'সহজ', 'হিকমাহপূর্ণ' ও 'বাস্তবসম্মত' - এই শব্দগুচ্ছের আড়ালে এমন এক আরামের পথ বেছে নেয়, যে পথে কোন বিতর্ক বা আদর্শের দ্বন্দ্বের ঠোকাঠুকি নেই। এটাই অতীত ও বর্তমানের মুনাফিকদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তারা সর্বদা আত্মোৎসর্গের তুলনায় আত্মরক্ষা করতেই সদা তৎপর।

ইবনে আব্বাস একবার বলেছিলেন যে,"*আল্লাহর রাসূল ﷺ ছিলেন সবচেয়ে দয়াশীল ব্যক্তি*"। দেখা যায় তাঁর দয়ার উদাহরণ দেখাতে গিয়ে আমরা দরিদ্রদের

প্রতি তাঁর দানশীলতার উদাহারণ টেনে আনি, অথচ আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে এর উদাহরণ দেয়া যায় যেটি নিয়ে আমরা সচরাচর ভাবি না, আর তা হলো সত্যের প্রচারে কোন বাধা-বিপত্তি দ্বারা অবদমিত না হয়ে তাঁর নিজের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দেয়া। অর্থাৎ মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য যেখানে স্বার্থপরতা, আর নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য হবে নিঃস্বার্থতা। পশ্চিমা বিশ্বের মুসলিম সংগঠন, নেতা, দা'ঈ, এমনকি সাধারণ মুসলিম- প্রত্যেকের উচিত নিজেদের দিকে একবার ফিরে দেখা, নিজেদের কে প্রশ্ন করা পুঁজিবাদী ধ্যানধারণার প্রভাববলয় থেকে কি তারা নিজেদের দ্বীনের কাজকর্মকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন? তাঁরা কি পেরেছেন দ্বীনের মূলনীতিগুলোকে সততার সাথে আঁকড়ে ধরে রাখতে? নাকি নিজের গা বাঁচানোটাই তাদের কাছে মুখ্য? যদি বলা হয় **"আরাম-আয়েশ অথবা দ্বীনের কল্যাণে ঝুঁকি"** - এ দুয়ের মাঝে যেকোনো একটি বেছে নাও - তবে তারা কোনটিকে বেছে নিতে প্রস্তুত? তাঁরা কি নিজেদের ক্ষণস্থায়ী চাহিদাকে অধিক গুরুত্ব দেবেন, নাকি আল্লাহর দ্বীনের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও সঠিকভাবে একে তুলে ধরার প্রয়াসে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে দ্বীনের দীর্ঘস্থায়ী উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হবেন? তাঁরা কি মুনাফিকদের আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিফলন নিজেদের মাঝে ঘটাবেন, নাকি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর পথকে বেছে নিবেন? কোনটি বেছে নেবেন তারা? আদর্শ নাকি আত্মরক্ষা?

সুরা আল-বুরুজ এর "আসহাবুল উখদুদ" (গর্তের অধিবাসী) গল্পটির ব্যাপারে সাইয়্যিদ কুতুব বলেছিলেনঃ

"গল্পের ঈমানদার মানুষগুলো নিজেদের ঈমানকে বিক্রি করে দিয়ে দুনিয়ার জীবন লাভ করতে পারত সত্যি, কিন্তু তাতে তাদের আর পুরো মানবজাতির লাভ থেকে ক্ষতির পাল্লাটাই কি অনেক বেশি ভারি হত না? তারা বেঁচে থাকলেও তারা একসময় পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যেতেনই, সাথে তারা একটি মহাসত্যকে গলা টিপে হত্যা করত, (কিন্তু ঈমানের জন্য নিজের জান বিসর্জন দিয়ে তারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে তবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিল)। ঈমান ছাড়া জীবন মূল্যহীন, আর স্বাধীনতা ছাড়া জীবন হয় মর্যাদাহীন। আর যালিমরা যখন মানুষদের শরীর ও আত্মার উপর আধিপত্য ফলায়, পুরো জীবনটাই তখন হয়ে যায় মৃত, নষ্ট, দূষিত।"

*طارق مهنا*
*তারিক মেহান্না*

*প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি*

*আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮*

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৫০

## পরিক্ষা মুজাহিদকে শক্তিশালী করে

কাল পতাকা

Senior Member

১২-১৪-২০১৫

আল্লাহতা'আলা কুরআনে সুরা আলে ইমরানের ১৮৬ নং আয়াতে বলছেন,

*"নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে তোমাদের সম্পদ ও জীবনের দ্বারা ..."*

কিছু লোকের জন্য এই পরীক্ষা হতে পারে দারিদ্র। কারো জন্য হতে পারে মারাত্মক কোন শারীরিক কিংবা মানসিক অসুস্থতা। আবার কিছু মানুষের জন্য ভালবাসার মানুষকে হারানো। কারও জন্য তা বন্দীদশা। তবে আমাদের প্রত্যেকের জন্যই, আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে এটা একটা প্রতিশ্রুতি যে, তিনি আমাদের মধ্যে সবাইকেই জীবনের কোন না কোন সময়ে, কোন একধরনের পরীক্ষার মুখোমুখি অবশ্যই করবেন। আপনি নবীতুল্য এক সৎকর্মশীল ব্যক্তিত্ব হোন কিংবা একজন খুনীর মতন ঘৃণ্য কিছু, আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমান দুঃখ-কষ্ট নির্ধারন করে রেখেছেন। আল্লাহতা'আলার প্রেরিত নবীগণ যে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে তা ভালো করে খেয়াল করলে আপনার কাছে মনে হবে যেন আল্লাহতা'আলা আগে থেকেই আপনার আমার জন্য এই জিনিসগুলোকে উদাহরণ হিসেবে রেখে দিয়েছেন যাতে আমরা আজকের সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারিঃ

আদম (আঃ) এর এক পুত্র আরেক পুত্রকে হত্যা করেছিল।

নূহ (আঃ) এর এক পুত্র ছিল কাফির, পানিতে ডুবে যার মৃত্যু হয়েছিল।

ইব্রাহিম (আঃ) এর বাবা ছিল এক অত্যাচারী মুশরিক।

ইউসুফ (আঃ) কে অন্যায়ভাবে দীর্ঘ দিন কাটাতে হয়েছিল কারাগারে।

আইয়্যুব (আঃ) কে সম্মুখীন হতে হয়েছিল মারাত্নক ধরনের সব অসুখের।

ইয়াকুব (আঃ) দুইবার সাময়িকভাবে পুত্রহারা হয়েছিলেন (একবার ইউসুফ(আঃ), আরেকবার বিন ইয়ামিন)।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন, জীবনের উপর নেমে এসেছিল ঝুঁকি, অল্প বয়সী সন্তানদেরকে হারিয়েছিলেন, প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাকে হারিয়েছিলেন, প্রাণপ্রিয় চাচা তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল পরপারে, তার নিজের জন্মভূমি থেকে হয়েছিলেন বিতাড়িত।

তাই বলা চলে এখনকার দিনে আমরা যে সমস্যা গুলোর মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে এমন একটি সমস্যাও নেই যেগুলো পূর্ববর্তী কোন নবী-রাসুল মোকাবিলা করেন নি। এর অনেক্গুলো ফাযায়েল আছে, যেমনঃ

আমাদের কাছে প্রত্যেকটি কষ্টকর পরীক্ষার নমুনা রয়েছে এবং সেই সাথে রয়েছে সেগুলো ধৈর্য্যের সাথে মোকাবিলা করার পর্যাপ্ত দিক নির্দেশনা।

আল্লাহতা'আলার সবচাইতে প্রিয় বান্দাদেরকে এই ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতিগুলোর মুখোমুখি হবার ঘটনা থেকে আমরা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে এই সকল বিপদময় পরিস্থিতির মোকাবিলা মানুষকে পূর্ণতা দান করে।

আল্লাহ যেখানে প্রিয় বান্দা অর্থাৎ নবী-রাসূলদেরকেই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করেন, তাই আপনিও যদি তেমন কঠিন কোন পরীক্ষায় পতিত হন তাহলে একথা বলার অবকাশ নেই, "আমি কেন?", কেননা আপনার থেকেও অধিক প্রিয় বান্দাদেরকেই আল্লাহ পরীক্ষা করেন।

নবীদের সাথে আমাদের অন্তত একটা দিকে সাদৃশ্য থাকার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

যখন আমরা নিজেরা কোন সমস্যার সম্মুখীন হবো তখন নবীদের কষ্ট-ত্যাগ ইত্যাদি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব, ফলে আল্লাহতা'আলার নবী - রাসুলদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

আল্লাহতা'আলার উপর আপনার ভরসা বেড়ে আকাশচুম্বী হবে যখন আপননি জানবেন নবীদের কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি আপনাকেও সাহায্য করবেন যদি আপনি তাক্বওয়া অবলম্বন করেন।

এমনকি নবীরাও আল্লাহতালার পক্ষ থেকে পরীক্ষার উর্ধ্বে নন-এই সত্যটি সমগ্র সৃষ্টির উপর আল্লাহতা'আলার একচ্ছত্র আধিপত্যের বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে।

কাজেই এই আয়াতে আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার যে ওয়াদা করেছেন তা আমাদের কাছে অপছন্দনীয় ঠেকতে পারে, কিন্তু এর থেকে অনেক বেশি লাভ করার আছে এই অনিবার্য পরীক্ষা থেকে, যদি আমরা আমাদের অবস্থাকে নবীদের অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখতে পারি।

*طارق مهنا*

*তারিক মেহান্না*

*প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি*

*আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮*

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১৩

# উদারতা ও দানশীলতাকে শেখার উপায়

কাল পতাকা

Senior Member

১২-১০-২০১৫

সূরা আল ইমরানের ১৮০ নং আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন –

*"এবং তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে কৃপণতা করলে তাদের ভালো হবে..."*

কিছু কিছু দিক দিয়ে আমরা সবাই একইরকম। আমাদের সবাইকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার রহমত ও নিয়ামত দান করেছেন, বেশি হোক আর কম হোক। আমরা সবাই ভালোবাসি আমাদের যতটুকু আছে তার চাইতে আরো বেশী পেতে। মুখে আমরা যাই বলি না কেন – যখন আমাদের নিজের কোন জিনিস ত্যাগ করতে হয়, তখন আমরা সবাই সামান্য হলেও দ্বিধা বোধ করি। এবং আমরা সবাই খুব ভালোমতো বুঝি আল্লাহর জন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করার গুরুত্ব কী ও এর মূল্য কত বড়। এটা হতে পারে সেটা দরিদ্রকে অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে সাহায্য করা, কিংবা হতে পারে আল্লাহর পথে অন্য কোন ত্যাগ স্বীকার করা। আমরা আমাদের এই উপলব্ধি অনুসারে কাজ করি বা না করি, আমাদের এই উপলব্ধিগুলো সার্বজনীন।

এই উপলব্ধিকে কাজে পরিণত করা এবং মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বগুলো ঝেড়ে ফেলার সবচেয়ে সহজ উপায় কি?

সবচাইতে সহজ উপায় হল, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ধাপে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার যেই নিয়ামতগুলো আপনি ভোগ করছেন সেগুলো এক এক করে গুণতে শুরু করুন। সেটা হতে পারে মনে মনে, মুখে মুখে, বা কাগজে লিখে; সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার যেই নিয়ামতগুলো আপনি ভোগ করছেন তার একটা লিস্ট বানানো শুরু করে দিন। সবচেয়ে ছোট এবং আপাত দৃষ্টিতে অগুরুত্বপূর্ণ নিয়ামতটাও লিস্টে টুকে রাখুন...

ভাবুন আপনার জীবন নিয়ে, আপনার প্রতিটি নিঃশ্বাস, আপনার দৃষ্টিশক্তি এবং আপনার শরীর সম্পর্কিত সব কিছু -আপনার বাড়ি-গাড়ি, পোষাক-আশাক, খাবার এবং সব ধরণের সম্পদ - আপনার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কাজকর্ম, মসজিদ এবং আপনার সমাজ ও সামাজিকতা। ভাবুন আপনার স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবার ক্ষমতা – জীবনের আনন্দের মুহূর্তগুলো - আপনার প্রতি আপনার স্বামী বা স্ত্রীর ভালোবাসা – ইসলাম – বিশুদ্ধ বাতাস – ঠাণ্ডা পানি –আপনার নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার অনুভূতি – যেই দয়া, উদারতা ও ভালোবাসা আপনি অন্য মানুষের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। আপনি খেয়াল করে দেখেবেন, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে এরকম অসংখ্য নিয়ামত আপনি ভোগ করছেন, যেগুলো লিখে শেষ করা যাবে না।

কিছুদিন আগে আমি একটা ম্যাগাজিন আর্টিকেল পড়ছিলাম, যেটাতে ইন্ডিয়া ও আফ্রিকার কিছু জায়গায় পানি স্বল্পতার জন্য কি কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এসব জায়গাতে, প্রতিদিন সকালে, প্রত্যেক পরিবারের মায়েরা হেঁটে ছয় ঘণ্টার পথ পাড়ি দেওয়ার পর এক কলসী পানি পান, তারপর তারা সেটা বয়ে আনেন, এবং তারপর সেই এক কলসী পানি দিয়ে পুরো পরিবারের খাওয়া, গোসল ও রান্নার কাজ সারতে হয়, কেননা পানির আর কোন উৎস তাদের হাতের নাগালে নেই!

আর আমি কারাগারে সেলে আছি তাতে কি? শুধু উঠে দাড়িয়ে দু'পা হেটে গিয়ে বেসিনের একটা বোতাম চাপলেই, সেকেন্ডের ব্যাবধানে ইচ্ছামতো বিশুদ্ধ, ঠাণ্ডা পানি পেতে পারি। প্রথম দৃষ্টিতে আপনাদের কাছে হয়তো এটাকে একটা অভিশাপ মনে হবে, কারণ আমি কারাগারে। কিন্তু সেইসব মায়েদের সাথে তুলনা করুন একবার – যারা এত সহজে বিশুদ্ধ পানি পাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না – তখনই বোঝা যায়, কারাগারে সেলে বসেও আমি প্রতিদিন যেসব নিয়ামত ভোগ করছি তার মধ্যে এই পানি একটি। চিন্তা করে দেখুন,জেলে বসে আমি যদি এরকম নিয়ামত ভোগ করি, তাহলে বাইরের স্বাধীন, মুক্ত জীবনে আপনার নিয়ামতের লিস্ট কতো লম্বা হবে!

কাজেই এই নিয়ামতগুলোর তালিকা তৈরি করে ফেলুন। লিস্ট যতো বড় হবে আপনি ততো গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন, আপনার চোখের সামনে থেকেও কত কী আপনার নজর এড়িয়ে গেছে। আপনার নাকের ডগায় থাকা সত্ত্বেও এতদিন কি নিয়ে আপনি সামান্যতম চিন্তাটুকুও করেননি। এবং তারপর আপনি উপলব্ধি করবেন, আপনি এই সব কোনকিছু পাবারই যোগ্য নন। এসব কিছুই আপনার প্রতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমত, যা তিনি তাঁর অসীম করুনার বশে আপনাকে দান করেছেন। এর কোনটার উপরই আপনার কোন অধিকার নেই। এবং আপনি যখন আপনার লিস্টের উপর বারবার চোখ বোলাবেন এবং দেখতে পাবেন, কিভাবে আপনার শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার অসীম ভালোবাসা, উদারতা ও করুনায় আপনাকে একটার পর একটা নিয়ামত দান করেছেন – তখন আপনি আপনার হৃদয় ও মনে পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

মানুষের স্বভাব হল, তার সাথে যেমন ব্যবহার করা হয়, অন্যের সাথে সে তেমনই ব্যবহার করে। সারাজীবন যদি আপনার সাথে খারাপ ব্যাবহার করা হয় তাহলে আপনার স্বাভাবিক প্রবণতা হবে মানুষের সাথে রুক্ষ ব্যবহার করা, কারণ আপনি তেমনটাই শিখে এসেছেন। একইভাবে আপনার সারাজীবন যদি আপনি উদারতা, দয়া ও করুণার পেয়ে আসেন, তাহলে আপনি মানুষের সাথে সেভাবেই আচরণ করবেন; কারণ আপনি সেই শিক্ষাই পেয়েছেন। আমাদের সমস্যা হল, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতিনিয়ত আমাদের দয়া, করুনা ও উদারতা দেখাচ্ছেন – প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি সেকেন্ডে – কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই আমরা এটা মনে রাখি না, কিংবা মনে রাখলেও এই করুনার পরিধি ও মাত্রা নিয়ে চিন্তা করি না।

তাই আমাদের উদার ও দানশীল হবার পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুক্ষ বাঁধাটি হল, আমাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দয়া ও করুণা সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা। যতো বেশী আপনি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিয়ামতগুলোকে আবিষ্কার করবেন, গুণতে থাকবেন – এবং আপনি যতো উপলব্ধি করবেন যে এই অসংখ্য নিয়ামতের কোনটারই যোগ্য আপনি নন – আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত থেকে অপরকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা আপনি তত

বেশি অনুভব করবেন। উদারতা ও দানশীলতাকে ভালবাসতে শেখার সবচেয়ে সহজ উপায় এটাই।

*طارق مهنا*

*তারিক মেহান্না*

*প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি*

*আইসোলেশন ইউনিট- সেল #১০৮*

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৬৪

# আল-কোরআনে মানুষের বৈশিষ্ট্য very nice

[কাল পতাকা]

Senior Member

১২-২৯-২০১৫

## পতাকা তুলে নাও ...

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জীবনে চলার পথে আমরা নানান ধরনের মানুষের সাথে পরিচিত হই। তবে আমরা আমাদের পছন্দসই শ্রেণীর সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। তাদেরকে নিয়ে,তাদেরকে ঘিরে আমাদের জীবন সাজাই। তাই কুরআন খুললে আপনি দেখতে পাবেন আল্লাহ্* আপনাকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আমরা যেন এইসব শ্রেণীর কার্যক্রম এবং পরিণতি দেখে সঠিক শ্রেণীটির অংশ হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারি সেজন্য কুরআনে আল্লাহ্* সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন স্বভাবের মানুষের বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এর উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখতে পাইঃ

মু'মিনরা *'অর্থহীন বিষয়ে লিপ্ত হয় না'* (২৩:৩) আর *'অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি তাদের সামনে উপস্থিত হলে তারা নিজেদের সম্মান সমুন্নত রেখে বিনয়ের সাথে সেসব বিষয় এড়িয়ে যায়'* (২৫:৭২)।

অন্যদিকে *'এমন মানুষও আছে যারা অর্থহীন কথাবার্তায় নিমজ্জিত থাকে'* (৩১:৬)। এই দুই শ্রেণীর সাথে পরিচিত হওয়ার পর আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনি কোন দলের অংশ হতে চান। তারপর সিদ্ধান্ত নিন।

সামনে এগোলে আল্লাহ্* আপনাকে অন্য এক শ্রেণীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এরা *'অসহায়দের খাবার দিতে উৎসাহিত করে না'* (৮৯:১৮) এবং *'নিজেদের ধন-সম্পদ গভীরভাবে ভালোবাসে* (৮৯:২০)। একই সাথে তিনি এদের বিপরীত শ্রেণীর সাথেও পরিচয় করিয়ে দেন যারা *'অন্যদেরকে যা দেওয়া*

*হয়েছে তা নিয়ে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং দারিদ্র্যের হুমকির সম্মুখীন হয়েও নিজেদের উপর অন্যের কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়।* (৫৯:৯)

আপনি পরিচিত হবেন তাদের সাথে *'যারা নিতান্ত অলসভাবে এবং লোক দেখানোর জন্য সলাতে দাঁড়ায় আর আল্লাহকে কদাচিৎ স্মরণ করে।'* (৪:১৪২) এবং তাদের সাথেও *'যারা নিজেদের সলাতে বিনয়ী এবং একাগ্রচিত্ত* (২৩:২)।

এমন মানুষও আপনার জীবনে আসবে যারা শুধুই *'ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে আর চতুষ্পদ জন্তুর মতো খাওয়া-দাওয়া করে* (৪৭:১২) আবার সেই সমস্ত চিন্তাশীল লোকেরা আপনাকে নাড়া দিয়ে যাবে যারা *'আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি নৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে'* (৩:১৯১)।

*'নিজের প্রবৃত্তিকেই রবের আসনে বসিয়ে নিয়েছে'* (৪৫:২৩) এমন মানুষের পাশাপাশি *'অন্যান্য সবকিছুর চেয়ে আল্লাহকে বেশী ভালবাসে'* (২:১৬৫) এমন মানুষও আপনি দেখতে পাবেন।

এমনকি আপনি অবাক হয়ে আবিষ্কার করবেন যে ১৪০০ বছরের পুরোনো কুরআন কি অবিকলভাবে আজকের এই পৃথিবীর গল্প আপনাকে শোনাচ্ছে! কুরআন যেন আমাদের সময়ের নেতৃবর্গ আর সরকারসমূহের কথাই বলছে *'যারা পৃথিবীর বুকে অত্যাচারের নেতৃত্ব দেয় এবং পৃথিবীর মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে অনুগত করে রাখে আর তাদের মাঝেই একদলের সন্তানদের হত্যা করে তাদের উপর অত্যাচার চালায়'* (২৮:৪) আর *'যারা অনুগত হতে অস্বীকার করে তাদের জেলে বন্দী করে রাখার ভয় দেখায়।'*( ২৬:২৯) এই শাসকেরা *'মুসলিম নারী শিশুদের আগুনের মুখে ঠেলে দেয় '* (৮৫:৫) *'শুধু এই কারণে যে তারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে।'* (৮৫:৮) অথচ এই অত্যাচারীরাই নিজেদের অর্থবিত্ত ও প্রযুক্তিতে অগ্রগামী এবং সভ্য সমাজের মুখপাত্র দাবী করে। **(২৮:৭৬)** আর এতেই কেউ কেউ ধোঁকা খেয়ে তাদের কুফর এবং অন্যদের উপর তাদের অত্যাচারকে বেমালুম ভুলে গিয়ে বিস্ময়ভরা চোখে তাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে ভাবে, যদি তাদের মতো হতে পারতাম! **(২৮:৭৯)** কিছু সত্যনিষ্ঠ আলেম মানুষকে সচেতন করতে উঠে দাঁড়ায় **(২৮:৮০)**। এর ফলে কিছু মুসলিম জেগে ওঠে এবং শত্রুর ভূমিতে নিগৃহীত হওয়ার পর ইসলামের

ভূমিতে হিজরত করে **(১৬:১১০)** এবং কেউ কেউ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে নির্যাতিত নারী-পুরুষ এবং শিশুদের রক্ষার্থে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে **(৪:৭৫)**। তবে অধিকাংশ মানুষই দিনের পর দিন অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে তোলা এসব শত্রুর ভূমিতে থাকাটাই পছন্দ করে **(৪:৯৭)**। শুধু তাই নয় বরং গৃহপালিত দাসের মতো ***'বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না'*** (৩:১৬৮) এটুকুও যেন যথেষ্ট নয়। যেই অত্যাচারীরা -

- পরিস্কারভাবে '***একে অপরের সহযোগী*** ( ৮:৭৩, ৪৫:১৯),
- যারা চায় আমরা যেন ইসলামকে নির্বিষ তত্ত্বকথায় পরিণত করি,**(৬৮:৯)**
- আমরা ইসলাম পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে তাদের অনুসরণ করলেই শুধু যারা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে, **(২:১২০)**

সেই অত্যাচারী কাফির গোষ্ঠীকে দুনিয়ার মোহে আবিষ্ট কিছু মুসলিম মিত্র হিসাবে গ্রহণ করে। তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের সেই মিত্রদের আশ্বাস দিয়ে বলে, ' "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে " আমরা শেষ পর্যন্ত তোমাদের সাথে আছি।' **(৫৯:১১)** কিন্তু যেহেতু '***এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকে ও নয় ওদিকে ও নয়*** (৪:১৪৩) , তাই তারা মু'মিনদেরকেও আশ্বস্ত করে বলে যে আমরা তো বিশ্বাসী **(২:১৪)** আর আমরাও তো ইয়ে ... মানে ... আসলে উম্মাহর বিজয়ই চাই। আর তাই '***যারা পরীক্ষায় পড়লেই পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়'*** (২২:১১) এমন মানুষদের সাথে আপনাকে মানিয়ে নিতে হবে। তবে আপনি এমন মানুষের দেখা পাওয়ার সৌভাগ্যও লাভ করবেন ***'যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে'*** এবং ' ***যাদের সংকল্প বিন্দুমাত্র ও পরিবর্তিত হয়নি*** (৩৩:২৩)

আর এভাবেই কুরআন পড়ার সময় মানবজাতির সর্বোত্তম থেকে শুরু করে সর্বনিকৃষ্ট পর্যন্ত নানান বৈচিত্র্যময় চরিত্রের মানুষ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য আপনার সামনে উপস্থাপিত হয়। আল-হাসান আল-বাসরি (র) বলেন, 'তোমাদের আগে যারা এসেছিল তারা কুরআনকে আল্লাহ্*র পক্ষ থেকে কতগুলো বার্তার সংকলন হিসাবে দেখত। তারা রাতের বেলায় এগুলো নিয়ে চিন্তা করত আর দিনের বেলায় তা কাজে পরিণত করত।'

সুতরাং এবার নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, 'আমি এদের মধ্যে কোন দলটির অংশ হতে চাই? আমি কি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি?'

কুরআন আপনার দিকে ঠিক এই চ্যালেঞ্জটাই ছুঁড়ে দেয়।

ড. তারেক মেহান্নার 'Carry the flag' প্রবন্ধ থেকে সংক্ষেপিত এবং অনুদিত।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫৩০

# নিয়ত বনাম ইমেজ সচেতনতা

কাল পতাকা

Senior Member

১২-১৫-২০১৫

আল্লাহ তা'আলা সূরাহ আলে-ইমরানের ১৮৮ তম আয়াতে বলেছেনঃ

*"তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং নিজেরা যা করেনি, তার জন্যেও প্রশংসিত হতে ভালবাসে, তুমি কখনো ভেবো না এরা (বুঝি) আল্লাহর আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছে। বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।'*

আবু সাঈদ খুদরী (রা) এই আয়াতের পটভূমি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺযখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হতেন, তখন এক দল মুনাফিক পেছনে পড়ে থাকতো আর জিহাদে শামিল হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে ভেবে খুব প্রফুল্ল বোধ করতো। যেই না রাসূলুল্লাহ ﷺ লড়াই শেষে ফিরে আসতেন, এই মুনাফিকের দল যার যার কৈফিয়ত নিয়ে তাঁর সামনে হাজির হত। ইসলামের জন্য নিজের আন্তরিকতা প্রমাণে তখন তারা ব্যতিব্যস্ত। এদিকে মদীনাবাসীরা ভাবতো তারা হয়তো জিহাদে গেছে, তাই তারা এই লোকগুলোর প্রশংসা করতো। মুনাফিকরা নিজেদের গুণগান শোনার জন্যে মুখিয়ে থাকতো, তারা আবার প্রশংসা শুনতে ভালোবাসে কী না! অথচ যে কাজের জন্য তাদের তারিফ করা হচ্ছে, তারা সে কাজটি পর্যন্ত করে নি।

যদিও আয়াতটি একটি ইবাদতের ব্যাপারে (জিহাদ) নাযিল হয়, আমাদের সামাজিক জীবনের জন্য খুব অসামান্য একটি শিক্ষা এ আয়াতের মাঝে লুকিয়ে আছে।

আমরা চাইলে শিক্ষণীয় সেই নির্যাসটুকু বের করে নিজেদের চরিত্র গঠনের কাজে লাগাতে পারি। আমাদের সময়ে এই শিক্ষাটির গুরুত্ব অনেক বেশি, কেননা আজ আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে নিজেদের "ইমেজ" বা ভাবমূর্তি নিয়ে

সবাই প্রয়োজনের চাইতে বেশি সচেতন। "অমুক আমাকে নিয়ে কী ভাবলো, তমুক আমাকে নিয়ে কী চিন্তা করলো, সমাজ আমাকে নিয়ে কী মনে করলো!" - এই চিন্তায় সবাই অস্থির। কখনো কখনো সেই অস্থিরতা এতোটাই বেশি লাগামছাড়া হয় যে অন্যের প্রশংসা লাভের আশায়, আমরা নিজেরা যা নই তা প্রমাণ করার জন্য, নিজেকে জাহির করার জন্য আমরা তৎপর হয়ে পড়ি। প্রতিযোগিতায় পূর্ণ এ দুনিয়ায় মেকি চেহারা আর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হলেও অন্যের সম্মান আর প্রশংসা কুড়োনোর প্রবণতাটা যেন বেড়েই চলেছে। এই আয়াত আমাদেরকে কৃত্রিমতার খোলস থেকে বের হয়ে আসার শিক্ষা দেয় এবং সেসব মুনাফিক্বদের মুখোশ উন্মোচন করে, যারা কিনা নিজেরা যতোটা না তারিফের যোগ্য, তারচেয়েও বেশি গুণকীর্তন খুঁজে বেড়াতো।

একজন মুসলিমের নিজের উপর ততটুকু আত্মবিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন যতটা হলে সে নিজেকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে দেখানোর প্রয়োজন বোধ করবে না। ইমাম আহমাদকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জ্ঞানার্জন করেন কি না, উত্তরে তিনি যা বললেন সেখানে নিজেকে বড় দেখানো তো দূরে থাক, আল্লাহর জন্য বিশাল কিছু একটা করে ফেলছেন সেই ভাবটুকু পর্যন্ত ছিল না! তিনি কেবলই বিনয়ভরে বলেছিলেন, "আসলে আমার কাছে হাদীসগুলো ভালো লেগেছিলো, তাই আমি সেগুলি সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলাম, এই আর কী!" আবু বকর আস-সিদ্দীক্ব (রা) কে কেউ প্রশংসা করলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে দু'আ করতেনঃ "হে আল্লাহ! তারা আমাকে যা মনে করে, আমাকে তারচেয়েও উত্তম হওয়ার তাওফিক্ব দান করুন এবং তারা আমার সম্পর্কে যা জানে না, সে জন্যে আমাকে ক্ষমা করে দিন।" অথচ নবী-রাসূলদের পরে দুনিয়ার বুকে জন্ম নেয়া মানুষগুলোর মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ! সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে এটিই যে সালাফগণ মানুষের কাছে নিজেদেরকে খুব বড় মাপের কিছু প্রমাণে মোটেও ব্যস্ত ছিলেন না। সত্যি বলতে কী, তারা এই "ইমেজ" বা ভাবমূর্তি নিয়ে কোন চিন্তাই করতেন না। তারা ছিলেন বাস্তব জগতের নিতান্তই কিছু সাদাসিধে বাসিন্দা, মাটির মানুষ, মানুষকে দেখানোর ব্যাপারে অনাগ্রহী, শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে তটস্থ।

আপনি যদি এই মানুষগুলোর মতো হতে চান তাহলে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না, শুধু আপনি যাদেরকে অভিভূত করার সংগ্রামে লিপ্ত, সেই মানুষগুলোকে

তাদের সত্যিকার আসনে বসিয়ে দিলেই চলবে! হ্যাঁ, আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে তারাও ঠিক আপনার মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ, বীর্য ও ডিম্বাণু থেকে যাদের জন্ম, দুর্বল, অসহায়, সীমাবদ্ধ, এবং ত্রুটিপূর্ণ। এ সুবিশাল বিশ্ব চরাচরে তারা কতই না তুচ্ছ! আর তাদের তুলনায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কতো বেশি শক্তিশালী, কতটা ক্ষমতাধর, সেটা নিয়ে কখনো ভেবে দেখেছেন? তবে কে আপনার সময়, শ্রম ও মনোযোগ পাওয়ার অধিকতর দাবীদার? একবার যদি আপনার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা স্থান পায়, তাহলে দেখবেন, আস্তে আস্তে অন্যরা কে কী ভাবলো সেটা নিয়ে আপনি কম মাথা ঘামাচ্ছেন। তখন একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকে আপনি অধিক মনোযোগী হয়ে উঠবেন। সত্যি বলতে কী, আপনি যদি এমনটি করতে পারেন, কিছু-না-চাইতেই দেখবেন যে মানুষের চোখে আপনি মহৎ একজন হয়ে গেছেন, সবার অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন। মানুষ সাধারণত খাঁটি ব্যক্তিত্বদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যারা লোকের প্রশংসা কুড়োতে মরিয়া নয়, তারা যেমন, তেমনই থাকে। আপনি লক্ষ করবেনঃ এ মানুষগুলো নিজের ব্যক্তিত্বের কারণেই লোকের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়। লোকেরা তাকে এই-সেটা ভাবুক এটা তার চাওয়া নয় এ কারণেই তাকে কোন আলগা ভাব নিতে হয় না।

এখানে প্রথম ব্যাপারটি জুড়ে ছিল এই "ইমেজ সচেতনতা" অন্যদের উপর কী প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে আলোচনা। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, এই নিন্দনীয় স্বভাবটি স্বয়ং আপনার উপর কী প্রভাব ফেলে তা বোঝার চেষ্টা করা। আপনি যখন দেখবেন মানুষ আপনাকে যা মনে করেছে আপনি আসলে তা নন, তখন নিজের ভেতর মারাত্মক অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা বোধ করবেন, অনেকটা নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করার মতো। বিশ্বের নামকড়া সেলিব্রিটিদের মধ্যে হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার আধিক্যের দিকে খেয়াল করুন! তারা যখন আবিষ্কার করে বাহিরের জগতের সামনে তার যে সেলিব্রেটি রুপ উপস্থাপন করা হয়, তার সাথে তাদের একান্ত ব্যাক্তিগত জীবনের বিস্তর ফারাক আছে, তখনই একরাশ বিষণ্ণতা তাদের উপর জেঁকে বসে। তারা যে মেকি জীবন যাপনের ভান করছে, সেটি কেবল-ই একটি মিথ্যে ছলনা, একটি অলীক অভিনয় - সেই তেঁতো অনুভূতি তাদেরকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। এই ব্যাপারটি আরেকটু ছোট পরিসরে ঘটে তাদের

সাথেও, যারা নিজেরা বাস্তবে যা নয়, তারচেয়েও বড় করে নিজেকে মানুষের সামনে হাজির করতে চায়।

আপনি হয়তো ভাবছেন যে মানুষকে বোকা বানাতে পেরে, নিজেদেরকে জাহির করে এ লোকগুলো খুব আনন্দবোধ করে। কিন্তু ২০১০ সালের জুন মাসে 'সাইকোলজিকাল সায়েন্স" নামক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি রিসার্চ অনুযায়ী তার উল্টোটাই প্রমাণিত হয়। এখানে একদল নারীর উপর অনুসন্ধান করা হয়, তাদের প্রত্যেককে দেয়া হয় একটি করে ব্র্যান্ডের সানগ্লাস (ক্লো ব্র্যান্ডের সানগ্লাস), যার মূল্য ৩০০ ডলার। কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবীকে বলা হয় তারা যে সানগ্লাসটি পরেছে, তা আসল ব্র্যান্ডের চশমা, আর অন্যদেরকে বলা হয় এগুলো আসলে নকল। এরপর তাদের সবাইকে একটি গণিত কুইজ দেয়া হলো, সেখানে জিতলে ১০ ডলার পুরস্কার, আর তারা নিজেরা নিজেদের কুইজ মার্কিং করবে। দেখা গেলো, যারা জানতো তারা আসল ব্র্যান্ডের চশমা পরেছে, তাদের মাঝে মাত্র ৩০ ভাগ নিজেদের নম্বর প্রদানে জালিয়াতি করেছে, আর যারা ভেবেছিল তারা নকল চশমা পরেছে, তাদের শতকরা ৭০ জনই মিথ্যের আশ্রয় নেয়।

পরিসংখ্যানের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরেকটি কাজ দেয়া হয়ঃ কম্পিউটার স্ক্রিনের ভেতর কিছু বিন্দু গণনা করা; কে কোন বিন্দু পর্যন্ত গুনেছে আছে তা নির্ধারণ করবে সে কতো ডলার পুরস্কার পাবে। এখানেও দেখা গেলো, যারা নকল সানগ্লাস পরে আছে বলে ভেবেছে, তারা গণণাকৃত বিন্দুর অবস্থান নিয়ে অনেক বেশি মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে, অথচ যারা ভেবেছে তাদের সানগ্লাস আসল তারা এতোটা করে নি। তৃতীয় অংশ ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব যেখানে তাদেরকে নৈতিকতা, সততা প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়। এখানেও প্রকাশ পেলো যারা জানতো তারা নকল জিনিস পরিহিত, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যদের ব্যাপারেও একই রকম ধারণা পোষণ করে, অন্যদেরকে অসৎ ও নীতিহীন মনে করে। চতুর্থ ভাগে তাদেরকে এমন কিছু প্রশ্ন করা হয় যার মাধ্যমে বোঝা যায় একজন নিজের থেকে কতোখানি দূরত্ব বোধ করছে। এখানেও একই ব্যাপার! যারা জানতো তাদের মাঝে নকল কিছু নেই, তাদের তুলনায় যারা ভেবেছে নকল গ্লাস পরেছে, তারা নিজেদের থেকে বেশি দূরত্ব বোধ করছিল।

চমকপ্রদ এই পরিসংখ্যানটিও এ উপসংহার টানে যে, নকল জিনিসপত্র পরে একজন মানুষ কাজেকর্মে এবং মনের দিক থেকেও তিক্ততা অনুভব করে, অন্যদিকে যারা জানে তারা আসলটাই পরেছে, তারা হয় অধিক সৎ, নীতিবান ও পরিতৃপ্ত।

*طارق مهنا*

*তারিক মেহান্না*

*প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি*

*আইসোলেশন ইউনিট - সেল নম্বর # ১০৮*

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪২০

## আপনার উপর আল কুর'আনের ৯ টি হক

কাল পতাকা

Senior Member

০৮-২৯-২০১৫

কুরআনুল কারীম বিশ্ব মানবতার জন্য এক অফুরন্ত নিয়ামাত। আল্লাহ তা'আলার বড়ই মেহেরবানী যে, তিনি আমাদের উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে, 'বড়ই মেহেরবান তিনি (আল্লাহ) কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন' -[সূরা আর-রহমান : ১-২]।

কুরআন এমন একটি কিতাব যার মাধ্যমে আরবের সেই বর্বর জাতি সৌভাগ্যবান জাতিতে পরিণত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন দিয়েই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তৈরি করেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বমানবমন্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আমার যুগ' -[সহীহ বুখারী : ২৬৫২]। কুরআন মাজীদের বেশ কিছু হক রয়েছে যেগুলো আদায় করা আবশ্যক। এর অনেকগুলো হক এমন যে, কেউ যদি তা আদায় না করে কিয়ামাতের দিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করবেন। কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর রাসূল বলবেন (কিয়ামাতে), ''হে আমার রব, নিশ্চয় আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে'' -[সূরা আল-ফুরকান : ৩০]

আমাদের উপর কুরআনের যে হকগুলো রয়েছে তা এখানে আলোচনা করা হলো :

১ ঈমান আনা

২ সহীহভাবে পড়তে জানা

৩ তিলাওয়াত করা ও শ্রবণ করা

৪ অপরকে শিক্ষা দেয়া

৫ হিফয বা মুখস্ত করা

৬ বুঝা ও উপলব্ধি করা

৭ আমল করা (বাস্তবায়িত করা)

৮ যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া

৯ কুর'আন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা

১ ঈমান আনা

কুরআনের হকসমূহের মধ্যে প্রধানতম হক বা অধিকার হলো কুরআনের প্রতি ঈমান আনা। কুরআনের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো : কুরআন আল্লাহর কালাম, ইহা আসমানী শেষ কিতাব এবং এই কিতাবের মধ্য দিয়ে সকল আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গিয়েছে। কুরআন বিশ্ব মানবমন্ডলীর জন্য হিদায়াত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর বা আলো। কুরআনে এসেছে, 'অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং আমি যে নূর অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আন। আর তোমরা যে আমল করছ আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত' -[সূরা আত-তাগাবুন : ০৮]।

'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে! আর কিয়ামাতের দিন তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আর আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন' -[সূরা আল-বাকারাহ : ৮৫]।

২ সহীহভাবে পড়তে জানা

কুরআন শিক্ষা করা ফরয করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন পড়া জানতে হবে। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে, 'পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' [সূরাহ আলাক : ১]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তা তিলাওয়াত কর' [মুসনাদ আল-জামি' :

৯৮৯০]।

৩ তিলাওয়াত করা ও শুনা

কুরআন তিলাওয়াত করা কুরআনের অন্যতম হক। কুরআন মাজীদে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এভাবে, 'তোমার প্রতি যে কিতাব ওহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত কর' -[সূরাহ আনকাবুত : ৪৫]।

সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। তিলাওয়াতের আদবগুলো রক্ষা করতে হবে। বাংলাভাষায় উচ্চারণ করে পড়লে হবে না।

আবূ হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কুরআন সুন্দর উচ্চারণে পড়ে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে শামিল নয়' -[সহীহ বুখারী : ৭৫২৭]।

ধীরস্থীরভাবে তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে। 'তুমি কুরআনকে তারতীলের সাথে অর্থাৎ ধীরস্থীরভাবে তিলাওয়াত কর' -[সূরা আল-মুযযাম্মিল : ৪]।

আর কুরআন তিলাওয়াতে রয়েছে বিরাট সাওয়াব। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ' -[সুনান আত-তিরমিযি : ২৯১০]।

কুরআন তিলাওয়াত শুনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'তুমি আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও, আমি বললাম, আপনার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, আমি আপনাকে কীভাবে কুরআন শুনাবো? তখন তিনি বললেন, আমি অপরের নিকট থেকে কুরআন শুনতে ভালবাসি' -[সহীহ বুখারী : ৫০৪৯]।

৪ অপরকে শিক্ষা দেয়া

কুরআনের অন্যতম হক হলো তা অপরকে শিক্ষা দেয়া। আমাদের প্রিয় নবীর অন্যতম কাজ ছিল মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, ''অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল''-[সূরা আলে ইমরান : ১৬৪]।

কুরআন শিক্ষা দেয়ার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই। হাদীসে এসেছে, উসমান রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়'-[সহীহ বুখারী : ৫০২৭]।

যদি কেউ অপরকে কুরআন শিক্ষা দেয়, তবে তাঁর জন্য শিক্ষাগ্রহণকারীর সমান সাওয়াবের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। হাদীসে এসেছে,

''ভাল কাজের পথপ্রদর্শনকারী এ কাজ সম্পাদনকারী অনুরুপ সাওয়াব পাবে'' -[সুনান আত-তিরমীযি : ২৬৭০]।

৫হিফয বা মুখস্থ করা

কুরআন হিফয করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজেই কুরআন হিফযের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ হিফযেরই এক প্রকার হচ্ছে, বান্দাদেরকে কুরআন হিফয করানো। যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুরআনকে সংরক্ষণ করেছেন। কুরআনে এসেছে,

''নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী'' -[সূরা আল-হিজর : ০৯]।

যে যত বেশি অংশ হিফয করতে পারবে তা তার জন্য ততই উত্তম। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'' কুরআনের হাফেযকে বলা হবে কুরআন পড়ে যাও, আর উপরে উঠতে থাক, ধীর-স্থিরভাবে তারতীলের সাথে পাঠ কর, যেমন দুনিয়াতে তারতীলের সাথে পাঠ করতে। কেননা জান্নাতে তোমার অবস্থান সেখানেই হবে, যেখানে তোমার আয়াত পড়া শেষ হয়'' -[সুনান আত-তিরমিযী : ২৯১৪]।

৬ বুঝা ও উপলব্ধি করা

কুরআনের অর্থ বুঝা ও অনুধাবন করা কুরআনের অন্যতম হক। কুরআনের অর্থ না বুঝতে পারলে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ও দাবী আমরা কেউ পালন করতে পারবো না। না বুঝে পড়লে কুরআনের আসল মজা পাওয়া যাবে না। কুরআন বুঝার জন্য শব্দের অর্থ, আয়াতের ব্যাখ্যা, অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বা প্রেক্ষাপট এবং কুরআনের আয়াতসমূহের শিক্ষা জানতে হবে। কুরআনে এসেছে, ''নিশ্চয় আমি একে আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার''-[সূরা ইউসুফ: ০২]।

কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে হাদীসের সাহায্য না নিলে যে কেউ বিভ্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে হাদীসের সাহায্য নিলেই কেবল সহীহভাবে কুরআন বুঝা সম্ভব। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, ''আর রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও''-[সূরা আল-হাশর: ৭]।
কুরআন বুঝার পাশাপাশি তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

''তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না ? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে''- [সূরা মুহাম্মাদ : ২৪]।

৭ আমল করা

কুরআনের আমল করার অর্থ, কুরআনের অনুসরণ করা। কুরআন অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ে তোলা। এ বিষয়ে কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর' -[সূরা আল-আরাফ : ৩]।

কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমরা যখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কুরআনের দশটি আয়াত শিক্ষা গ্রহণ করতাম, এরপর ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা পরবর্তী দশটি আয়াত শিক্ষা করতাম না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই দশ আয়াতের ইলম ও আমল শিখতাম’ -[শরহে মুশকিলুল আছার : ১৪৫০]।

৮ যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া

কুরআন মাজীদ সম্মানিত এবং যারা কুরআনের সাথে থাকবে তাঁরাও সম্মানের অধিকারী। এজন্য কুরআনের যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তাঁর হক আদায় করতে হবে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তাঁরা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তাঁরাই তাঁর প্রতি ঈমান আনে। আর যে তা অস্বীকার করে, সে-ই ক্ষতিগ্রস্থ’ -[সূরা আল-বাকারাহ : ১২১]। কুরআনকে মহববত করা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মহববত করার শামিল। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘যে কুরআনকে মহববত করল সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মহববত করল’-[জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ৩২৯]।

৯ কুরআন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা

কুরআনের প্রচার, প্রসার ও তা প্রতিষ্ঠার কাজ করা কুরআনের অন্যতম হক। নিজ ব্যবস্থাপনায় কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা, হিফয প্রতিযোগিতা, কুরআন বুঝার আসর, তাফসীর প্রতিযোগিতা, মাকতাব চালু করা, বিভিন্ন এলাকায় কুরআনের মুয়াল্লিম প্রেরণ বা মুয়াল্লিম স্পন্সর করা, কুরআন বিতরণ করা, কুরআনের মুয়াল্লিম তৈরি করা, কুরআনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত সংস্থাকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা, এ কাজের অন্তর্ভুক্ত। সর্বোপরি কুরআনের বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠার কাজ করতে হবে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, ‘আর আমি যেন আল-কুরআন অধ্যয়ন করি, অতঃপর যে হিদায়াত লাভ করল সে নিজের জন্য হিদায়াত লাভ করল; আর যে পথভ্রষ্ঠ হল তাকে বল, আমিতো সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত’ -[সূরা আন-নামল : ৯২]।

হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও [সূরা আল-মায়িদাহ : ৬৭]।

কুরআন তিলাওয়াত, হিফয, প্রচার, প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার কাজে আনন্দ প্রকাশ করার সুযোগ রয়েছে। কুরআন এমন একটি কিতাব যা নিয়ে ঈমানদার বান্দাহগণ আনন্দ প্রকাশ করতে পারে। কেননা আল-কুরআনে বলা হয়েছে, ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧ قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨﴾ [يونس: ٥٧، ٥٨]

‘হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিফা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। বল, আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে। সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়। এটি যা তারা জমা করে তা থেকে উত্তম’ -[সূরা ইউনুস : ৫৭-৫৮]।

আবূ সাইদ খুদরী রাদি আল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহর অনুগ্রহ হলো আল-কুরআন এবং এর অধিকারী হওয়াই রহমত’ -[শুয়াবুল ঈমান]। প্রিয় পাঠক!

আমরা কি কুরআনের হকগুলো আদায় করতে পারছি? আদায় করার জন্য কোন প্রচেষ্টা আছে কি? আসুন কুরআনের হকগুলো আদায় করি, কিয়ামাতের সেই ভয়াবহ দিনে কুরআনের সুপারিশ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করি। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে কুরআনের হকগুলো যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দিন। আমীন!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৫৫

# যে শরীয়ত মানে না তার মুরুব্বি শায়তান

কাল পতাকা

Senior Member

০৭-১৬-২০১৫

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

**وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ**

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে। জুখরুফ- ৩৬-৩৭

এখান থেকে আমরা জানতে পারি, যারা আল্লাহ তায়ালার কুরান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (জাহেল হোক বা আলেম) কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করে না, শয়তান তাদের মুরাব্বি হয়ে যায় অথচ তারা নিজেদেরকে সাহাবাদের পূর্ণ আনুসারি দাবি করতে থাকে।

সুতরাং আজ যারা পূর্ণ দ্বীন পালন করেনা, জিহাদ থেকে বাধা দেয়, তাগুত ও দুনিয়াদারদের পিছনে ঘুরে বেড়ায়, দ্বীনের খেদমতের নামে দ্বীনকে নিজের খেদমত করায়, খেলাফতের নামে কুফুরি করে তারা নিজেদেরকে যতই শাইখুল হাদিস আর মুজাহিদে আজম মনে করুক না কেন আমরা তাদেরকে কখনোই হেদায়াত প্রাপ্ত মনে করব না, তাদের কথায় ধোকা খাব না। কেননা আল্লাহ তায়ালাই বলে দিচ্ছেন তারা গোমরাহ হওয়া সত্বেও নিজেদেরকে أهل سنة و الجماعة মনে করবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৩০৫

# ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

imanupdate

Junior Member

১১-১৯-২০১৫

ঈমান অর্থ্ বিশ্বাস। আর এই ঈমানই আমাদের মূল জিনিস কারণ ঈমান ছাড়া কো ইবাদতই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য না। সূরা আসরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল মানুষকেই প্রথমে ক্ষতিগ্রস্থ বলেছেন। কিন্তু পরের আয়াতেই ৪টি গুণ সম্পন্ন মানুষদেরকে এই ক্ষতির বাইরে রেখেছেন। আর এই ৪টি গুণের প্রথমটিই হচ্ছে ঈমান।

আর বিনষ্টকারী বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, যার অস্তিত্বের কারণে অন্য কোনো জিনিস বিনষ্ট বা বাতিল হয়ে যায়। এ কথা অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সালাত বিনষ্ট বা বাতিল হওয়ার যেমন কিছু কারণ ও বিষয় আছে, ঠিক তেমনিভাবে ঈমান বিনষ্টকারী কিছু কারণ ও বিষয় আছে। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি সালাতরত (নামাজরত) অবস্থায় সালাত বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর যে কোনো একটি, যেমন সালাতের মধ্যে শব্দ করে হাঁসলে, কিছু খেলে অথবা কিছু পান করলে তার সালাত যেমন বাতিল হয়ে যাবে, ঠিক তেমনি ঈমান বিনষ্টকারী কিছু বিষয় আছে, যার মধ্যে বান্দা পতিত হলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। ফলে সে কাফের-মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে।

ঈমান বিনষ্টকারী বেশ কিছু কারণ আছে। ইমাম ইবনুল কাইউম রহ. ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.সহ অন্যান্য বিদ্বান এরকম ১০টি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও কারণগুলো ১০ এর ভিতর সীমাবদ্ধ নয়। আরও বেশ কিছু ঈমান ভঙ্গের কারণ আছে। ইনশাআল্লাহ, আমরা এই প্রবন্ধে প্রধান প্রধান ১২ টি ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করতে যাচ্ছি।

ঈমান বিনষ্টকারী প্রধান বারটি বিষয় নিম্নে দেয়া হলো:

১। আল্লাহর সাথে শরীক করা: আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং রাসূল সা. কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

অর্থ:

"নিশ্চয়ই তুমি যদি আল্লাহর সাথে শরীক কর, তোমার সকল আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" [সূরা যুমার: ৬৫]

রাসুল সা. যখন শিরক করলে ছাড় পেতেন না, তখন তাঁর উম্মাত শিরক করলে ছাড় পাবার কোন সম্ভাবনাই আর বাকি থাকল না। এই শিরক এমন এক গুনাহ, যার থেকে মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পাবার আগে তওবা করে যেতে না পারলে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। আল্লাহ আরও বলেন:

অর্থ:

"কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম।"

[সুরা মায়েদা:৭২]

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, কাউকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত-মানসা করা, অন্যকে উপকার ও অপকারের মালিক মনে করা, আল্লাহর যেমন ক্ষমতা, অন্য কারো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে বিশ্বাস করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাহ করা, মাজারে সিজদাহ করা, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আইন বিধানদাতা মানা, মানব রচিত আইনের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়া ইত্যাদি সবই শিরক; যা একজন মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

২। আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে এমন মাধ্যম বানানো যার কাছে বান্দা সুপারিশ কামনা করে এবং তার ওপর তাওয়াক্কুল করে:

মহান আল্লাহ বলেন: অর্থ:

"তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন অন্যদের ইবাদত করে, যারা না পারে তাদের ক্ষতি করতে আর না পারে কোন ভাল করতে। তারা বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। বল(হে মুহাম্মদ)! তোমরা কি আল্লাহকে আসমান ও

জমিনের মধ্যকার ঐ জিনিসের ব্যাপারে সংবাদ দিতে চাও, যা তিনি জানেন না। তারা যে সমস্ত শির্ক করছে আল্লাহ পাক এর থেকে পবিত্র ও উচ্চ।" [সূরা ইউনুস:১৮]

এটা হচ্ছে আউলিয়া এবং নেককার লোকদের কবরে যারা যায়, তাদের অধিকাংশের অবস্থা। তারা সেখানে গিয়ে কবরবাসীকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন ইবাদতে লিপ্ত হয়। কবরবাসী আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারবে এ বিশ্বাসে তাদের কাছে দোয়া করে। তাদের উদ্দেশ্যে মানত করে। পশু যবাই করে। তাদের কাছে সাহায্য কামনা করে এবং কবরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। এসব কাজ কুফর ও শিরক যা কিনা ঈমান ভঙ্গের কারণ।

মক্কার কাফিররা নবী-রাসুল ও ওলী-আউলিয়াদের আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে তাদের মূর্তি বানিয়ে তাদের পূঁজা করত। আর তারা বলত: অর্থ: "আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।" [সুরা যুমার:৩]

আর এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেন:

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ হেদাআত করেন না তাকে যে মিথ্যাবাদী কট্টর কাফের।" [সূরা যুমার:৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তাদের শুধু কাফির না, কট্টরপন্থী কাফির বলেছেন। অথচ তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের আনুগত্য করে, শুধুমাত্র এ জন্যই করে যাতে তারা আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারে। কিন্তু এই কারণেই তারা আল্লাহর নিকটবর্তী না হয়ে বরং মুশরিক ও কট্টরপন্থী কাফিরে পরিণত হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, রাসূলগণ আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যে মাধ্যম বটে, কিন্তু এর অর্থ শুধু সংবাদ পৌঁছানের মাধ্যম।

৩। মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের কুফরী মতবাদতকে সঠিক মনে করা: মহান আল্লাহ বলেন:
অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম।" [আল ইমরান: ১৯]

অন্যত্র তিনি বলেন,

অর্থ: "কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায়, তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" [সুরা আলে ইমরান:৮৫]

এখানে সন্দেহ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, মুসলিম উম্মাহ যার কাফের হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষন করে; তার কুফরীর ব্যাপারে কোনো মুসলিমের সন্দেহ পোষণ করা।

যেমন ইহুদী, নাসারা, মাজুসি (অগ্নি পুজারি), বৌদ্ধ, জৈন, মূর্তি পূজারী হিন্দু, পৌত্তলিকদের শিরক ও কুফরীর ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর কোনো দ্বিমত নেই। তাই কোনো মুসলমান এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। করলে সেও ইজমার দলীল দ্বারা কুফরী মতবাদে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। এ দৃষ্টিকোন থেকে জাহেলি যুগের মুশরিক যারা নিজেদের মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে নিজেরাই স্বাক্ষ্য প্রদান করেছিলো, আর বর্তমান যুগের মুশরিক যারা ইসলাম ও ঈমানের দাবী করে অথচ আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট হককে গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, এই দুই ধরণের মুশরিকদের মধ্যে কোন পাথ্র্ক্য নেই। আল্লাহ বলেন: অর্থ: হে ঈমানদারগণ নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র।" [সূরা তওবা: ২৮] আজকাল অনেক নামধারী মুসলিমদের দেখা যায়, ইসলামের পাশাপাশি বিধর্মীদের ধর্ম্ বিশ্বাসকেও সঠিক মনে করে থাকে আর বলে, যে যে ধর্ম্ আছে সে সে ধর্মে থেকে জান্নাতে যেতে পারবে। এই আকীদাহ রাখা মাত্রই একজন মুসলিম দাবীদার কাফিরে পরিণত হয়ে যাবে। নেতা-নেত্রীদের অনেককেই দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় সমাবেশে গিয়ে বিধর্মীদের আকীদার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তব্য দিয়ে থাকে। এদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই; পায়ুপথ থেকে বায়ূ বের হওয়ার সাথে সাথে যেমন অজু ভেঙ্গে যায়, ঠিক তেমনি এইরূপ কুফরী আকীদা করার সাথে সাথে ঈমান ভেঙ্গে যায়।

**৪। রাসূল সা. কর্তৃক আনীত দ্বীন, অথবা (পূণ্য কাজের) সওয়াব অথবা (পাপের জন্য) শাস্তি এবং দ্বীনের যে কোনো বিষয়ে রং-তামাশা, বিদ্রুপ করা:** আল্লাহ তায়ালা বলেন: অর্থ: "আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল! তোমরা কি

আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলের সাথে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা কোন ওজর পেশ করো না। নিশ্চয় ঈমানের পর তোমরা কুফরি করেছ।।" [সূরা তাওবা: ৬৫-৬৬]

আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশে অনেক নাট্যানুষ্ঠানে ও সিনেমায় খারাপ চরিত্রের অভিনয়ের জন্যে দাঁড়ি, টুপি ও ইসলামী পোষাককে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আল-কুরআনের কোন শব্দ বা আয়াত, কোন ঘটনা প্রসঙ্গে বিশেষ কোনো নবীর নাম, কেউ কেউ এমন বিকৃতভাবে উচ্চারণ করেন যাতে বিদ্রুপ বুঝা যায়। এ ধরনের বিদ্রুপ উদ্দেশ্যমূলক হোক বা হাসি ঠাট্টামূলক হোক, সবই কুফুরী। আবার রাসুল সা. এর ব্যাঙ্গ কার্টুন প্রতিযোগিতা করা হয়। যা শুধু ঈমান ধ্বংসের কারণই নয় বরং এই কাজের কারণে তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

আল্লাহর রাসূল সা. এর অপমানকারীরা, ব্যাঙ্গকারীরা, বিদ্রুপকারীরা অতীতেও তওবা ও ক্ষমার সুযোগ পায়নি, ইনশাআল্লাহ আজও পাবে না।

আউস গোত্রের সাহাবী কর্তৃক কাব বিন আশরাফকে হত্যা, খাযরায গোত্রের সাহাবী কর্তৃক আবু রাফেকে হত্যা, কাবা ঘরের গিলাফ ধরে থাকা ইবনে খতালকে হত্যা এবং যে সকল মহিলা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে খারাপ কবিতা পড়েছিল তারা দাসী এবং মহিলা হওয়া সত্বেও তাদেরকে ক্ষমা না করে হত্যা করার ঘটনাগুলো কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের জন্য দলিল হয়ে থাকবে।

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের উপর আদেশ করছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াতকে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন তোমরা তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত বসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত হয়। (এমনটি করলে) তোমরা তো তাদের মতই হয়ে গেলে। আল্লাহ তা'আলা সব কাফির ও মুনাফিকদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন।" [সূরা নিসা:১৪০]

আবু বকর সিদ্দীক

মাসিক: আৎ-তাহরীদ জুন/২০১২

[বাকি ৮টি ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে পোষ্ট করা হবে]

ঈমান ভঙ্গের কারণ বাকি ৮টি

**৫। যাদু:** যাদুর মধ্যে রয়েছে (যাদু মন্ত্র দ্বরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিছিন্নতা সৃষ্টি করা; উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা)। তাছাড়া "তাওলার" আশ্রয় নেয়া। আর তাওলা হচ্ছে (যাদু মন্ত্রের সাহায্যে) স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে বশীভূতকরণ, যাতে স্ত্রীর ভালবাসায় স্বামী পাগল প্রায় হয়ে থাকে। এটা শিরক হওয়ার কারণ হচ্ছে, এর দ্বারা বিপদাপদ দূর করা এবং উপকার বা কল্যাণ সাধনের বিষয়টিকে গাইরুল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে কুফরী। আল্লাহ তায়ালা বলেন: অর্থ: "তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না" [সূরা বাক্বারা:১০২-১০৩]

**৬। মুসলিমদের বিরূদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেয়া ও সহযোগিতা করা:**
আল্লাহ তায়ালা বলেন:

অর্থ: "হে মুমিনগণ! ইহুদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয়ই তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না।" [সুরা মায়েদা: আয়াত ৫১]

বলার অপেক্ষা রাখে না সৌদি আরবসহ সারা বিশ্বের মুসলিম নামধারী শাসকরা আজ এতে লিপ্ত। চারদিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর যেই প্রান্তেই একদল মর্দে মুজাহিদ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য দাঁড়াচ্ছে, তাঁদেরকে এই মুসলিম নামধারী তাগুত নেতারা অমুসলিম কাফের তাগুত শাসকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। আর মুসলিম নামধারী অনেকে ইহুদী-খ্রিস্টান, তাগুত শাসকদের সাথে মুখে মুখ আর সুরে সুর মিলিয়ে মর্দে মুজাহিদদের জঙ্গি, সন্ত্রাসী ইত্যাদি নামে নামকরণ করছে।

আর এই মুসলিম নামধারী তাগুত শাসকেরা নিজেদের ভূমিকে খুলে দিয়েছে এই ইহুদি খ্রিস্টান শাসকদের জন্য এবং নিজেদের সেনাবাহিনী দ্বারা তাদের অবিরাম মদদ দিয়ে চলছে। এমনকি এই মর্দে মুজাহিদদের অবর্ত্মানে তাদের বিবি বাচ্চাদেরও তুলে দিচ্ছে এই বিধর্মী তাগুত শাসকদের হাতে।

**৭। মূর্তি, প্রতিমা, মানব রচিত সংবিধান ইত্যাদিসহ অন্যান্য তাগুতকে সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করার জন্য শপথ করা:** অন্তরে আল্লাহর দ্বীনের স্থান হবে ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে। দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং গাইরুল্লাহর প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে। দ্বীনের প্রকাশ হবে মুখে স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং কুফরী কথা পরিত্যাগের মাধ্যমে। এমনিভাবে দ্বীনের স্থান হবে অঙ্গ-প্রতঙ্গে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো কার্যকর করা এবং যাবতীয় কুফরী কর্ম পরিত্যাগ করার মাধ্যমে। এ তিনটি বিষয়ের কোন একটি বিষয়ে যদি বান্দা ভিন্নমত অবলম্বন করে তাহলে সে কুফরী করলো এবং দ্বীন পরিত্যাগ করলো বলে বিবেচিত হবে। [আদদুরার আস সানিয়া: ৮/৭৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি মূর্তি প্রতিমা বা মানব রচিত সংবিধানকে সম্মান দিল অথবা এগুলো রক্ষার জন্য শপথ করল, সে মূলত: তাগুতকে স্বীকার করে নিল। আর তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতিত কারো ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

**৮। মুহাব্বত ও ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথবা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করাঃ** আল্লাহ বলেনঃ

অর্থ: আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায় এবং তাদের প্রতি তেমনি মুহব্বত বা ভালবাসা পোষণ করে, যেমন ভালবাসা উচিৎ একমাত্র আল্লাহকে। কিন্তু যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাঁদের ভালবাসা সবচেয়ে বেশী।" [সুলা বাক্বারা:১৬৫]

এই আয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য গাইরুল্লাহকে ভালবাসা কাফেরদের স্বভাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল গাইরুল্লাহকে ভালবাসা কুফরী কাজ; যা ঈমান ভঙ্গের একটি কারণ।

৯। যে ব্যক্তি মনে করে যে, রাসুল সা. এর নিয়ে আসা বিধানের চেয়ে অন্য বিধান পরিপূর্ণ বা উত্তমঃ মহান আল্লাহ বলেন:

অর্থ: "না, (হে মুহাম্মদ) তোমার রবের কসম! তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক হিসেবে মেনে নিবে। অত:পর তুমি যাই ফয়সালা করবে, সে ব্যাপারে তারা

নিজেদের মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না বরং ফয়সালার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ন্ রূপে সমপ্র্ণ করবে।" [সুরা নিসা: ৬৫]

অর্থ্: "তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে আমি আজ পরিপূর্ণ্ করে দিলাম ও আমি সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের উপর আমার নিয়ামত এবং আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে কবুল করলাম।"[সূরা মায়েদা: ৩]

অতএব যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস করবে যে, রাসুল সা. এর হিদায়াতের চেয়ে অপর কারো হিদায়াত অধিক পূর্ণাঙ্গ অথবা রাসুল সা. এর দেয়া বিধি-বিধানের চেয়ে অপর কারো বিধি-বিধান অধিক সুন্দর। তবে সে ব্যক্তির ইসলাম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আজকাল লক্ষ লক্ষ মুসলিম নামধারী ব্যক্তি এ ধরনের বিশ্বাসে লিপ্ত। কেউ রাসুল সা. এর রেখে যাওয়া রাজনীতি, সমাজনীতি, অথ্নীতি, রাষ্ট্রনীতি ও আইন বিধানের চেয়ে অন্যদের আবিষ্কৃত এ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে অধিক সুন্দর মনে করছে। কেউ আবার রাসুল সা.-এর হিদায়াতের চেয়ে বিভিন্ন ভন্ড, ভ্রান্ত পীর-ফকীরদের তরীকার হিদায়াতরূপী বিদয়াতকে অধিক পূর্ণাঙ্গ মনে করছে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্ম্ নিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র সুফীবাদ ইত্যাদির প্রেমিকরা কি প্রকৃত অর্থে মুসলিম থাকতে পারে?

**১০। যে ব্যক্তি রাসুল সা. এর আনীত কোন বিষয়কে অপছন্দ করে:** যে ব্যক্তি রাসুল সা. এর আনীত কোন জিনিসকে ঘৃণা করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। যদিও বাহ্যিকভাবে সে এর উপর আমল করে। ইরশাদ হচ্ছে-

অর্থ্: "এটা এজন্য যে, এরা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাকে ঘৃণা করে, ফলে আল্লাহ তাদের আমলকে বাতিল করে দিয়েছেন।"[সুরা মুহাম্মদ: ০৯]

আজকাল অনেক নামধারী মুসলিমকেই পর্দা, দাঁড়ি, ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী শিক্ষা, আযান ইত্যাদিকে ঘৃণা করতে দেখা যায়। এ ধারাটি এদেরে উপর প্রযোজ্য। আর মুসলমান নামধারী কিছু মুরতাদ-কাফের আছে আমাদের সমাজে। তাদেরই একজন বলেছেন, আযান শুনলে আমার বেশ্যার আওয়াজের কথা মনে পড়ে।

এদের উপর মুরতাদের হত্যা বিধান কার্যকর করা খুবই জরুরী।

**১১। কোন কোন মানুষকে মুহাম্মদ সা. এর শরীআতের উর্দ্ধে মনে করা:** ঐ ব্যক্তি কাফের, যে মনে করে যে, কিছু মানুষ চেষ্ট-সাধনায় এমন পর্যায়ে উপনীত হতে

পারে যে, তখন তার আর রাসুল সা. এর শরীয়ত মান্য করার প্রয়োজন থাকে না। এ ব্যাপারে তারা মুসা (আ.) ও খাজির (আ.) এর ঘটনাকে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে।

অথচ সে ঘটনার সাথে তাদের এ ধারনার আদৌ কোন সামাঞ্জস্য নেই। কেননা, প্রথমত খাজির (আ.); মুসা (আ.) এর সম্প্রদায় ও তাঁর (মুসার) সীমানার বাইরে ছিলেন। দ্বিতীয়ত: বিশুদ্ধ মতে খাজির (আ.) সৃষ্টির ভাঙ্গা-গড়া বিষয়ক নবী ছিলেন। তাই তিনি মুসা (আ.) এর শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। অনেক ভ্রান্ত বাতেনী মারেফতপন্থী ব্যক্তিবর্গ নিজেদের রাসুল সা. এর শরীয়ার বাইরে মনে করে। তারা বলে, আমরা তো হাক্বীকতের মঞ্জিলে পৌছে গেছি। অতএব সাধারণের জন্যে উপযোগী শরীয়াহ আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। অথচ রাসুল সা. বলেন: অর্থ: "এ উম্মাতের কোন ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান যদি আমার কথা শোনে, অত:পর আমার উপর ঈমান না আনে, তবে সে জাহান্নমীদের অন্তর্ভূক্ত।" [সহীহ মুসলিম:৪০৩]
আল্লাহ তাঁর সর্ব্ শ্রেষ্ট ওলী ও তাঁর রাসূল সা. কে বলেন:

অর্থ: "আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর মৃত্যু আসা পর্য্ন্ত।" [সূরা হিজর:৯৯]
**১২। আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া:** আল্লাহর বাণী: অর্থ: "আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে।" [সুরা কাহাফ: ৫৭]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

অর্থ: যারা কাফের তারা ভীতি প্রদর্শিত বিষয়সমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। [সুরা আহকাফ:৩]
আমাদের দেশে এমন লোকের অভাব নেই। অনেকে আছেন কয়েকটা ডিগ্রী লাভ করেও ওজুটা ঠিকমত করতে পারে না। জিজ্ঞেসা করলে উত্তর দেন ফজরের সালাত বার রাকাত।

অনেকে পূজামন্ডপে বা আশ্রমে গিয়ে সুপ্রসন্ন ও সন্তুষ্টচিত্তে ওম্ শান্তি, ওম্ শান্তি –অভিবাদন, শঙ্খ ধ্বনির অভিনন্দন গ্রহণ করে। পৌত্তলিকদের হাতে, নিজের কপালে সিঁদুর-তিলক লাগালে যে কী হয়, সে মাসআলাটুকুও তারা জানে না।

তিনি কি তখন আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের উম্মাত থাকনে না কি রাম-দাস হয়ে যান সে পার্থক্যটুকুও জানার সৌভাগ্য ও জ্ঞান তার নেই।

আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জানার এ অনাগ্রহ ও অনীহাকেই সর্ব্ শেষ এ ধারায় সর্ব্ সম্মতভাবে ওলামায়ে ইসলাম কুফুর বলেছেন। এক কথায় আল্লাহর দ্বীন শেখা থেকে বিরত থাকা, দ্বীনি বিধান অনুযায়ী আমল না করা ও দ্বীন কায়েম করার আন্দোলন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে বিরত থাকাই হল দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা। যারা দ্বীন থেখে বিমুখ থাকবে, দ্বীন শিক্ষা করবে না, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জান মাল বাজি রাখবে না বা জিহাদ ও কিতালকে এড়িয়ে চলবে, তাদের মুসলিম দাবী করার অধিকার নেই। তাদের পুণরায় ঈমান নবায়ন করতে হবে।

*হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার আল হাফিয নামের উসীলায় ঈমান ধ্বংসকারী আকীদাহ, কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন এবং আপনার আর রহমান, আর রাহীম ও আল গাফুর নামের উসীলায় আমাদের ভূলগুলো ক্ষমা করে দিন। আমীন!*

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২২৮